দূষণ কোথায় পৃষ্ঠা ৩

ঝাড়খণ্ডে খনিজ শিকার পৃষ্ঠা ৭

পশ্চিমবঙ্গের ফলতায় শ্রমিক শোষণ
একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা পৃষ্ঠা ১৩

যুদ্ধের রূপান্তর পৃষ্ঠা ১৫

দেশের ভিতর যুদ্ধ বন্ধ করো
একটি আবেদন পৃষ্ঠা ২০

চিঠিপত্র :
বিষয় : দেশের ভিতর যুদ্ধ বন্ধ করো পৃষ্ঠা ২১
সম্পাদকের জবাব পৃষ্ঠা ২২

দয়ামণি বারলার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার পৃষ্ঠা ২

মন্থন সাময়িকী : ২০০৯ সালের আয়-ব্যয়ের হিসেব পৃষ্ঠা ২৪

মার্চ–এপ্রিল ২০১০ ❐ একাদশ বর্ষ ❐ দ্বিতীয় সংখ্যা ❐ ৬ টাকা

মন্থন সাময়িকী

কলিঙ্গনগরের সত্য

আবার কলিঙ্গনগরে পুলিশের গুলি চলল; নিহত হলেন ষাট বছরের বৃদ্ধ লক্ষ্মণ জামুদা। এবারের ঘটনাস্থল চান্ডিয়া গ্রাম। ২০০৬ সালের ২ জানুয়ারি ১৪ জন আদিবাসী হত্যার কেন্দ্র ছিল চম্পাকুইলা। মাঝখানে চারবছর পার হয়ে গেছে। টাটার প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার জন্য জমি দখল করতে স্থানীয় আদিবাসী সমাজের ওপর এই যুদ্ধ আজও অব্যাহত।

পুলিশ বলছে, 'আমরা কী করব? গ্রামবাসীরা তীর-ধনুক নিয়ে তেড়ে এসেছিল। তাই আমরা লাঠি আর রবারের বুলেট চালিয়েছি।' কী আশ্চর্য ঘটনা! গ্রামবাসীরাই আক্রমণ করছে আর বারবার তারাই জীবন দিচ্ছে, আহত হচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে! ধন্য আমাদের নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যম!

কলিঙ্গনগরের ঘটনায় আর একবার প্রমাণ হল, রাষ্ট্রের ঘোষিত যুদ্ধ 'মাওবাদী আতঙ্ক'-এর বিরুদ্ধে হলেও অঘোষিতভাবে সে যুদ্ধ জারি করেছে দেশের প্রতিরোধকামী সকল মানুষের বিরুদ্ধে; কিংবা যে কোন প্রতিবাদী মানুষের গায়েই সে হেলায় 'মাওবাদী' ছাপ লাগিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু আজকের কলিঙ্গনগরের ঘটনায় এটাও প্রমাণ হল, রাষ্ট্রের পেশিশক্তি, টাটার মতো কর্পোরেট পুঁজির ধনশক্তি আর তামাম কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমের প্রচারশক্তি হাত মিলিয়েও কলিঙ্গনগরের প্রতিরোধকে নির্মূল করতে পারেনি। টাটা, আর্সেলর মিত্তাল, রিলায়েন্স, পস্কোর আগ্রাসী পুঁজির জমি দখল অভিযান এখনও সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে পারেনি। রায়গড়, বস্তার, কলিঙ্গনগর, জগৎসিংহপুর, কেওনঝড়, গুমলা ও খুঁটির জনপ্রতিরোধ আজও অব্যাহত।

যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ২ এপ্রিল লালগড়ে এসে সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, তিনি দেশকে ২০১৩ সালের মধ্যে মাওবাদী আতঙ্ক থেকে মুক্ত করবেন। এসব কথা সংবাদমাধ্যমকে ডেকে বলাই যায়। কিন্তু সত্যটা কি তাই? নাকি তিনি ২০১৩ সালের মধ্যে কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলোর হাতে তাদের পছন্দ ও চুক্তি মোতাবেক দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দখলদারি তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?

প্রবীণ লক্ষ্মণ জামুদার নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশের প্রতিটি প্রান্তে বার্তা পৌঁছে গেল, কলিঙ্গনগর মরেনি।

দয়ামণি বারলার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

দয়ামণি বারলা ঝাড়খণ্ডের 'আদিবাসী মূলবাসী অস্তিত্ব রক্ষা মঞ্চ'-এর নেত্রী। এই মঞ্চের নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ডের গুমলা ও খুঁটি জেলায় বিশ্বের অন্যতম সর্ববৃহৎ ইস্পাত কোম্পানি আর্সেলর মিত্তালের প্রস্তাবিত ইস্পাত প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যা রাজ্যে এই কোম্পানি ২০১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে বাৎসরিক মোট ১২ মিলিয়ন টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি স্টিল প্ল্যান্ট নির্মাণ করতে চায়। ঝাড়খণ্ডের গুমলা ও খুঁটি জেলা মূলত মুন্ডা আদিবাসী সমাজের বাসস্থান। দয়ামণি বারলা নিজেও ওই সমাজেরই সন্তান। উড়িষ্যার কেওনঝড় জেলায় মূলত গোন্দ, মুন্ডা, দেহুরি ও সাউন্তি আদিবাসীদের বাস। ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে মিত্তাল স্টিল কোম্পানির সঙ্গে ঝাড়খণ্ড সরকারের চুক্তি হয়। ২০০৬-এর আগস্টে মিত্তাল স্টিলকে অধিগ্রহণ করে আর্সেলর কোম্পানি। এর একবছর পরে উড়িষ্যা সরকারের সঙ্গে নবগঠিত আর্সেলর মিত্তাল কোম্পানির একই ধরনের চুক্তি হয়। গুমলা ও খুঁটি জেলার মোট ১২০০০ একর জমি এই প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হলে প্রায় ৪০টি গ্রামের মানুষ পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। উড়িষ্যার কেওনঝড় জেলার পাটনা ব্লকে প্রস্তাবিত ৭৮০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হলে ১৫টি গ্রামের মানুষ উচ্ছেদ হবে। ১৩ জানুয়ারি ২০১০ দয়ামণি বারলার (সংক্ষেপে দ.বা.) সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন গর্গ চ্যাটার্জি। হিন্দি থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন প্রশান্ত হালদার।

প্রশ্ন : দয়ামনিজী আপনি কোয়েল-কারো আন্দোলনের পটভূমিটা আমাদের বলুন। কীভাবে শুরু হয়েছিল ওই আন্দোলন?

দ.বা.: ১৯৫৬-৫৭ সালের কথা। ওইসময় স্বাধীনতার পর দেশ জুড়ে 'ডেভলপমেন্ট'-এর নামে সরকার বড়ো বড়ো পরিকল্পনা তৈরি করছিল। রাঁচী জেলার কাছে দক্ষিণ ছোটনাগপুরে কোয়েল ও কারো দুটি বড়ো নদী বইছে। এর জল সরাইকেলা জেলার খরসাঁওয়া হয়ে পশ্চিমবাংলার দিকে গেছে। এতে সব সময় জল থাকে। এই দুটি নদীর ওপর আলাদা আলাদা বাঁধ বানানোর পরিকল্পনা নিল সরকার। কোয়েল নদী থেকে একটা বড়ো ক্যানাল কেটে কারোতে নিয়ে যাবে, সেখানে বাঁধ হবে — এইরকম পরিকল্পনা করা হল। প্রথমে লোকে বুঝতে পারেনি, কী হতে চলেছে। তারপরে সরকারের লোকেরা গ্রামে জমি সার্ভে করা শুরু করল, তখন লোকে বুঝতে পারল এখানে বড়ো বাঁধ তৈরি হবে। প্রজেক্টের পদাধিকারী যারা ছিল, তারা বলতে শুরু করল, যাদের জমি নেওয়া হবে, তাদের চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এর আগে রাঁচীতে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেখানে উচ্ছেদের অভিজ্ঞতা মানুষের আগেই ছিল। লোকে দেখেছিল, যারা উচ্ছেদ হয়ে যায়, তাদের কী অবস্থা হয়। গ্রামের কিছু কিছু লোক বিরোধিতা করতে শুরু করল। আস্তে আস্তে আরও লোক বিরোধে শামিল হল। প্রথমদিকে কোয়েল এবং কারো দুটি এলাকার লোকেরা আলাদা আলাদাভাবে বিরোধিতা শুরু করে। তারপরে তারা বুঝতে পারে, আমরা একই প্রজেক্টের বিরোধিতা করছি। তখন তারা সম্মিলিত হয়। কোয়েল-কারো পরিযোজনা বিরোধী সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠন সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখল, প্রথমে চারটি গ্রামে যারা উচ্ছেদ হবে, তাদের পুনর্বাসন ও চাকরির ব্যবস্থা করা হোক। তাহলেই এই প্রজেক্টের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এমন বাকি ৫৬টি গ্রামকে নেওয়া যাবে। সরকার এই প্রস্তাবে এক পা-ও এগোল না। তখন লোকেরা ঠিক করল, আমরা জান দেব, কিন্তু জমি দেব না। ১৯৮৭ সালের কাছাকাছি সরকার ওখানে ক্যাম্প বসালো। গ্রামের লোকেরা একজোট হয়ে ক্যাম্পকে অসহযোগিতা করা শুরু করল। কুয়ো থেকে জল তোলা আটকে দিল; গ্রামের জমিতে মলমূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করে দিল। গ্রামের লোকেরা বলল, তোমাদের যা করার ওই ক্যাম্পের মধ্যেই করো। পুরোদস্তুর অসহযোগ আন্দোলন, কখনও হিংসা ছিল না। ১৯৯৫-৯৬ সালের কথা, তখন সরকারের প্রস্তাব ছিল, বাঁধ ২০০ ফুট উঁচু হবে এবং তাতে ২০০টি গ্রাম প্লাবিত হবে এবং আরও ৫৬টি গ্রাম আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপরে সরকার বারবার নানা চাপ সৃষ্টি করতে থাকল। গ্রামের লোকেরাও আরও বড়ো আকারে বিরোধিতা করতে থাকল। লোকেদের বক্তব্য ছিল, জল আর জঙ্গল আমাদের পরিচয়ের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, এর পুনর্বাসন তোমরা কীভাবে করবে? সরকারের কাছে এর কোন জবাব ছিল না। এটা একটা সাংস্কৃতিক প্রশ্ন। এই সাংস্কৃতিক প্রশ্ন ওঠার পর সরকার একটু দুর্বল হয়ে পড়ল। তারপরে প্রকল্পের কাজ একটু স্থগিত থাকল। আবার নতুন রাজ্য গঠন হওয়ার পর তারা উঠেপড়ে লাগল। আন্দোলন কিন্তু ভেঙে যায়নি। স্থানীয় মানুষ ঢোকার রাস্তাগুলিতে ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল। ১ ফেব্রুয়ারি ২০০০ পুলিশ এসে ব্যারিকেড ভেঙে দিল। গ্রামবাসীরা ২ ফেব্রুয়ারি বিশাল জমায়েত করে দাবি জানায়, যে পুলিশরা ব্যারিকেড ভেঙেছে এবং গ্রামের লোককে মারধোর করেছে, তাদের শাস্তি দিতে হবে। এই জমায়েতের ওপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়, ৮ জন মারা যায় এবং ২০ জন জখম হয়। এরপর মানুষ শপথ নেয়, আমাদের আটজন শহিদ হয়েছে, আরও আটহাজার প্রাণ দেওয়ার জন্য তৈরি আছে। কিন্তু আমরা জমি দেব না, বাঁধ হতে দেব না। সরকার ঘোষণা করল, বাঁধ তৈরি স্থগিত থাকছে।

প্রশ্ন : আপনি এই আন্দোলনে কীভাবে এলেন?

দ.বা.: আগে আমি এনজিও করতাম। ১৯৯৩-৯৪ নাগাদ দিল্লির একটা এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত হই। সেই এনজিও-র সঙ্গে থেকে আমার এনজিও সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা হল। আদিবাসী ও দলিতদের নামে তাদের অনেক পয়সা আসে, মহিলা এবং বাচ্চাদের নামেও পয়সা আসে। সেই পয়সা জনসাধারণের মধ্যে যায় না। তারপর আমি দিল্লিতে ওই এনজিও-র মধ্যে তীব্র বিরোধিতা করি। এইসময় কোয়েল-কারোর আন্দোলন চলছিল। আমি তার সঙ্গে যুক্ত হই। আমি দেখলাম, সব জায়গাতেই আদিবাসীদের কীভাবে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। আমি ঠিক করলাম, আমি স্বাধীনভাবে নিজের সমাজের জন্য কাজ করব। এরপর আমি আন্দোলনে চলে গেলাম। তখন মোজেস গুড়িয়ার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। সোনা গুড়িয়ার নেতৃত্বে আন্দোলন চলছিল। আমি ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম। আমার কিছু কাজকর্ম দেখে ওরা আমাকে সঙ্গে নিল। আমি এনজিও-দের পুরোপুরি পরিত্যাগ করলাম এবং পুরোপুরি আন্দোলনে চলে গেলাম। এতদিনে আমার কিছু অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। আমি দেখেছি, আমাদের ছেলেরা, ভাইয়েরা মারা গেছে। আমি এগুলিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম। ঝাড়খণ্ডের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের কথা স্থির করলাম। তারপর থেকেই আমি আন্দোলনে আছি।

প্রশ্ন : আপনি কোন পার্টিতে গেলেন না কেন?

দ.বা.: বিজেপি বাদ দিয়ে সব পার্টিই আমার কাছে এসেছে। সব পার্টিই চায় তাদের নিজের দলে শামিল করতে। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় সব পার্টিই নিজের নিজের টিকিটে নির্বাচন লড়াতে চায়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন আছে, বিধায়ক হব কার জন্য, এমপি হব কাদের জন্য। ওই প্রশ্ন সাফ হলেই পার্টিতে যেতে হবে, রাজনীতিতে যেতে হবে।

প্রশ্ন : ঝাড়খণ্ডে যে বিনিয়োগ হচ্ছে, সে সম্পর্কে আপনার কী মত? আর্সেলর মিত্তালদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আপনার এবং আপনার সাথীদের নাম সামনে এসেছে। সেই আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে কিছু বলুন। কোন

... পরবর্তী অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

দূষণ কোথায়

পরমেশ গোস্বামী

দক্ষিণেশ্বরের ঘাট। সামনে ভরা বর্ষার গঙ্গা। মেটে ধূসর জলের ওপর ছায়া ফেলে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে চলেছে আকাশে। পারে বৃষ্টি-ধোয়া গাছের সারি, কোল ঘেঁষে কলকল জলের ধারা বয়ে চলেছে। জলে ভেসে চলেছে গুচ্ছ গুচ্ছ কচুরিপানা। নদীপার নির্জন, পারের কাছে শুধু একটি জেলে-ডিঙি। আবহমান কালের পটে আঁকা একটি ছবি যেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, যেখানে মেঘ সরে গিয়ে নীল আকাশ বেরিয়ে পড়েছে অনেকখানি, সেইদিকে ছন্দপতন ঘটাচ্ছে সার সার চিমনি থেকে বেরনো কালো ধোঁয়া। পিছনে আকাশের রঙ পাল্টে পাল্টে যায়, ধোঁয়া কিন্তু অবিকার।

সহসা নীরবতাকে খানখান করে একটি স্পিডবোট পাখিপাখালিদের চমকে দিয়ে উজানের দিকে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে গেল, পাড়ার পল্টু-ভোলারা হাঁ করে সেই উজ্জ্বলতা চেয়ে চেয়ে দেখল।

আরও কাছে, ডিঙি বেঁধে জাল হাতে হাঁটু জলে হেঁটে-চলা জেলের মুখ শুকনো। গঙ্গায় আর মাছ ওঠে না তেমন। জল যেন বিষ।

ঘাট থেকে একটু ভিতরে এক জটলা। তার কেন্দ্রে আশি বছরের এক বৃদ্ধা। গঙ্গার ধারে বসে একটু ঝিমুচ্ছিলেন। জেগে উঠে দেখেন বাড়ির লোকেরা চলে গেছে তাঁকে ফেলে। দক্ষিণেশ্বরে এ দৃশ্য নতুন নয়।

যে দিকেই নজর পড়ে, দূষণ আর দূষণ। কেন এত দূষণ? উত্তর খুঁজতে কষ্ট হবে না, তথ্য আছে অনেক। বই আছে, পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধ আছে। দূষণের কারণ বিশ্লেষণ করা আছে সেখানে। এত ধোঁয়া কেন বেরোয়? নদীর জলে এমন বিষ কেন? উদ্বৃত্ত টাকা খরচ করতে কেন আর পাঁচজনের মুখে ঝামা ঘষে দিতে হয়? ঘরের মানুষের জায়গা ঘরে হয় না কেন? এই সব কেন-র পিছনে আর-একটা কেন আছে। সেই ছড়াটার মতো : কেন রে নটে মুড়োলি? গরুতে কেন খায়? কেন রে গরু খাস? রাখাল কেন চরায় না! কেন রে রাখাল চরাস না? কেন-র পর কেন খুঁজতে খুঁজতে শেষে পাওয়া যায় এমন উক্তি, যার পরে আর 'কেন' নেই — 'খাবার ধন খাবো নি, গুড়গুড়াতে যাবো নি?' তখন টের পাওয়া যায় নটে গাছটি মুড়োনোর গোটা ব্যাপারটা কী। তখন কেন নয়, প্রশ্ন তখন, কী!

আমাদেরও প্রশ্ন : দূষণ তবে কী?

ইদানীং দেশে বিদেশে দূষণ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি ও বলাবলি হচ্ছে। ফলে, দূষণ বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় অনেকটাই। দূষণ কেন হয় কিংবা দূষণ থেকে মুক্তির উপায় কী তাও কতকটা বই পড়ে টিভি দেখে আমরা জেনে যাচ্ছি যুক্তির দিক থেকে! কিন্তু দূষণ প্রসঙ্গে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা ও লেখালেখি যতই হোক, দূষণ জিনিসটি প্রকৃতিগত ভাবে কী, তার উল্লেখ কোথাও তেমন থাকে না। দূষণ কেন হয় আর দূষণ কী, এ দুটি তো এক প্রশ্ন নয়।

অবশ্য দূষণের কাজ-চলা গোছের টেকনিকাল সংজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। যেমন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী, প্রতি ঘনমিটারে দশ মিলিগ্রামের বেশি আর্সেনিক থাকলে পানীয় জলকে আর্সেনিক-দূষিত বলা হয়।[১] হাওয়ায় সালফার ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে এই মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে কুড়ি মাইক্রোগ্রাম।[২] ভারতবর্ষের সরকারি মান অনুযায়ী, জনবসতির এলাকায় রাত্রিকালে পঁয়তাল্লিশ ডেসিবেলের বেশি শব্দ হলে তা দূষণ বলে গণ্য হয়।[৩]

এইসব সংজ্ঞা এলাকা-ভিত্তিক। পানের জল দূষণের এক রকম সংজ্ঞা, স্নানের জলের আর-এক রকম, তেমনি বায়ু দূষণের, শব্দ দূষণের। এক এলাকার সংজ্ঞা অন্য এলাকায় খাটে না। কোন-কোন এলাকার জন্য সংজ্ঞাই নেই। যেমন নতুন-আবিষ্কৃত বা সদ্য-ব্যবহার-শুরু-হওয়া পদার্থ থেকে হাওয়া বা জলের দূষণ, বা দৃশ্য-দূষণ। সব এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি সাধারণ সংজ্ঞা না হলে মন দূষণ সম্বন্ধে সাধারণ কোন ধারণা পায় না। অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে কাজে নামলে বিপত্তির প্রভূত সম্ভাবনা।

দূষণ বলতে আমরা ভাসা-ভাসা যা বুঝি তা হল বিকৃতি বা অস্বাভাবিকত্ব। কোনটা স্বাভাবিক, আর কতটা বিকৃতি হলেই বা তাকে অস্বাভাবিক বলব? হাওয়ায় অক্সিজেনের অংশ কিছুটা কমে কার্বন ডাইঅক্সাইডের অংশ কিছুটা বেড়ে গেলে আমরা হাঁসফাঁস করি, তা থেকে মৃত্যুও হতে পারে। তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি বাড়লেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে। অথচ হাওয়ার বা তাপমাত্রার কত রকমফের যে গ্রহে গ্রহে দেখা যায়, তার শেষ নেই। বস্তুত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রকৃতির খেয়ালে যে কাণ্ড ঘটে চলে, তার প্রায় সবটাই মানুষের সহ্যসীমার একেবারে বাইরে। তাকে দূষণ বলা অর্থহীন। পৃথিবীর উপরিতলের কিছু অংশে স্থান-কালের এক ছোটো পরিসরে মানুষের বাসযোগ্য একটু পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে কয়েক লক্ষ বছর ধরে। এখানে প্রকৃতির সাময়িক ওঠাপড়া যেটুকু ঘটে তা সাধারণত মানুষের সহ্যসীমার মধ্যে থাকে, আর দীর্ঘকালীন পরিবর্তনের গতি এত মন্থর যে তা চোখে পড়ে না। এই অবস্থা এতদিন ধরে (অর্থাৎ মানুষের ইতিহাসে এতদিন ধরে) আছে কী করে, তার কিছুটা আমরা আঁচ পাই, আবার অনেকটাই বুঝি না। বুঝে-না-বুঝে যে বিকৃতি ঘটাই, তা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা সব সময়ে থাকে না প্রকৃতির।

প্রকৃতির মধ্যে আমাদের বাস, প্রাকৃতিক সম্পদ না-হলে আমাদের চলে না, অথচ সেই সম্পদ ব্যবহার করতে গিয়ে কোথা থেকে যেন বিকৃতি এসে পড়ে, দূষণ ঘটে যায়! এ-ও দেখা যাচ্ছে, যাবতীয় দূষণ যেন মাত্রা ছাড়াতে চলেছে এই সাম্প্রতিক কালে, গত শ'খানেক বছরের মধ্যে। অথচ মানুষের স্বভাবে আচরণে এমন কোন মৌলিক ব্যত্যয় আজ দেখা যাচ্ছে না, যা দু-পাঁচ হাজার বছর আগে ছিল না।

নতুন যা ঘটেছে তার একটা দিক হল, জনসংখ্যা এমন মাত্রায় বেড়েছে যা ইতিহাসে কোনদিন দেখা যায়নি। অন্যটা হল, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে আগের চেয়ে অনেক দ্রুত হারে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধি যে পৃথিবীর একটা বড়ো সমস্যা, তা দেশনেতাদের খেয়ালে এসেছে বছর পঞ্চাশেক আগে। সেই ব্যাপারে ব্রেক কষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ফল-ও দেখা যাচ্ছে কতকটা। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তথ্য অত স্পষ্ট নয়। তবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে আর্থিক সম্পদ সৃষ্টি কী হারে হচ্ছে তার খানিকটা ধারণা পাওয়া যায় এক-একটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ধারাটি দেখে। এর গতি কিন্তু জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হারকে ছাপিয়ে যাচ্ছে বহুদিন যাবৎ। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে প্রতি দশকে এক শতাংশেরও কম হারে। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই হার বেড়ে হয় প্রতি দশকে আঠারো শতাংশের কিছু বেশি। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে এই হার দাঁড়ায় দশকপিছু পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি। পশ্চিম ইউরোপে এমন দ্রুত বৃদ্ধি শুরু হয়েছে আরও আগে থেকে।[৪]

এর থেকে মোদ্দা যে কথাটা বোঝা যায়, তা হল মানুষের গড় প্রয়োজন নির্ভুলভাবে ঊর্ধ্বমুখী। এযাবৎকাল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর টান

পড়বার একটা কারণ ছিল জনসংখ্যা-বৃদ্ধি। আগামী দিনে আরও বড়ো কারণ হয়ে দাঁড়াবে মানুষের প্রয়োজনের ঊর্ধ্বগতি — তার উন্নতির প্রেরণা।

এখন প্রশ্ন হল, কোন পথে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হলে তা সুস্থায়ী হবে, তার বিনাশ বা বিকৃতি এড়ানো যাবে? অবশ্য তার আগে সুস্থায়িত্ব কাকে বলব সেটা স্থির করে নেওয়া দরকার। সহজভাবে বললে যে ব্যবহার-রীতিতে সম্পদ ফুরোয় না বা বিকৃত হয় না তা-ই সুস্থায়ী। জগতে এমন কী আছে যা ফুরোয় না? বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। একমাত্র বিশ্বব্যাপারের চলনের ধর্ম বদলায় না। এই চলনের মধ্যে একটা নিহিত ছন্দ থাকে। সেই ছন্দকে নষ্ট করে এমন যা-কিছু, তাই হল অ-সুস্থায়ী!

ইদানীং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে ক্রমাগত অন্যতর সম্পদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সেইসব নির্মিত সম্পদ আর প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে একটা বৈরি সম্পর্ক চলতে থাকে। দেখা যায় যে এখন ফসল ফলে বেশি, শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় বেশি কিন্তু মাটি, জল, আকাশ, বাতাসের গুণহানি ঘটে চলে। প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমাগত বিনিয়োগের দ্বারা আর্থিক উন্নয়নের যে কাজকারবার চলে তা বিশ্বনিয়মের পারস্পরিক ছন্দগুলিকে ভেঙে দেয়, সেটা আজ অভিজ্ঞতা করা যাচ্ছে। এই ভাঙ্গনের পরিণতিতে দিন দিন কত কাজকারবার আর কত ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার-রীতি অ-সুস্থায়ী হয়ে উঠছে তার আর ঠিক নেই। জল নিয়ে টানাটানি, তেল-কয়লা-সহ নানান খনিজ সম্পদের আকাল, বায়ু দূষণ, পৃথিবীর উষ্ণায়ন, খাদ্যাভাব, গ্রাম থেকে নগরের দিকে মানুষের অন্তহীন যাত্রা, ঠেলাঠেলি-মারামারি-হিংসার লাগাতার ঊর্ধ্বগতি — সবই এই অ-সুস্থায়ী ব্যবহার-রীতির পরিচয় বহন করে।

এই ব্যাপারগুলি অনেকেরই যে জানা নেই এমন নয়। তবু প্রাকৃতিক সম্পদের এমন অবাধ লুন্ঠন চলে — মানুষ কেবলই উন্নতি করতে চায় বলে। অফিসে কাছারিতে, কলে কারখানায়, ইস্কুলে কলেজে, ঘরে ঘরে চলেছে সেই উন্নতির সাধনা। উন্নতি করতে গিয়ে যে মালমশলা লাগে তার জোগান দিতে গিয়ে প্রকৃতি রিক্ত হয়ে পড়েছে।

উন্নতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও তা প্রয়োগের আদর্শ মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই আছে। উন্নতিচর্চা জিনিসটা অনেকক্ষেত্রেই বস্তুগত এবং বাইরের বিষয়। আহারবিহারের উন্নতি, প্রযুক্তিপ্রকরণের উন্নতি, আয়ব্যয়ের উন্নতি হল উন্নয়নসাধনার একটা বড়ো দিক। অথচ উন্নতির কোন স্থির ও চরম মানদণ্ড নেই। উন্নতি জিনিসটাই স্বভাবে তুলনামূলক। তাই সার্বিক উন্নয়ন কথাটা অলীক, অনপেক্ষ উন্নতি বলেও কিছু হয় না। অর্থাৎ উন্নয়ন জিনিসটা আংশিক এবং উন্নয়নতত্ত্বের ভিতরে আছে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতকে নিরাপদ করবার জন্য।

নিরাপদ বোধ করবার আবেগ সহজাত। অথচ নিরাপদ বোধ করা সহজ কর্ম নয়। এই কর্মে লোকে অভিজ্ঞতার সাহায্য নেয়। পরীক্ষায় নিরাপদ থাকতে ছাত্র প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে, কোন কথা লোককে নিরাপদে বিশ্বাস করানোর জন্য সাধারণ লোকে মা-কালীর দিব্যি দেয় আর পণ্ডিতেরা কোটেশন দেন, যে-কোন কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে লোকে ঝুঁকি না নিয়ে মহাজ্ঞানী-মহাজন কোন পথে গমন করেছেন তার সুলুক-সন্ধান করে, বিবাহসম্পর্কে ভালোবাসা সুনিশ্চিত করতে লোকে পাত্রপাত্রীর আয়ব্যয়-মুখশ্রী-পছন্দ-অপছন্দ খুঁটিয়ে বিচার করে নেয়, আর যে-যেমন পারে সুবিধা বুঝে কোন-না-কোন দলে ভেড়ে।

অথচ নিরাপত্তার অভাববোধ এমন লাগাতার হতে পারে যে উপস্থিত-বুদ্ধি দিয়ে আচমকা পরিস্থিতির সামাল দেওয়া যাবে এমন ভরসা থাকে না। তাই একরকম ব্যবস্থাপনা লাগে। নিরাপত্তার অনুকূলে কিছু অভ্যাস-কিছু সংস্কার-তৈরি করে নেওয়ার দরকার হয়। নিজেকে কোন একটা দলের একজন মনে করা বা কোন দলকে নিজের মনে করা এমন একটি সংস্কার। কার্য-কারণ ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিত — এই সব মিলিয়ে একটা ছাঁচ বা প্যাটার্ন অনুসরণ করাও সেইরকম।

নিরাপত্তার তাগিদে লোকে আর একটি কর্ম করে, সে হচ্ছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। সে উদ্যোগেও তার সহায় হল সেই ছাঁচ। মন চায় হয়তো সম্পর্কসুখ, কিন্তু কী করে তা লাভ করা যাবে তা তার জানা নেই। সম্পর্কহীন একাকীত্বের থেকে নিরাপত্তা কেমন করে পাওয়া যাবে তা সে জানে না। আর-একটু কী হলে ভালো হয় বুঝে না পেয়ে সে ছাঁচের আশ্রয় নেয় — লোকে যারে বড়ো বলে বড়ো সেই হয়। লোকের চোখে যদি উন্নতি লাভ করতে পারি তাহলে নজরে পড়ব এবং পরিণতিতে ভালোবাসা পাব — অর্থাৎ সম্পর্কের স্বাদ পাব। এই সংস্কারের বশে মানুষ উন্নতির চেষ্টা করে চলেছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। উন্নতি একবার হতে থাকলে সম্পর্কসুখের সৌভাগ্য হয়তো আসে না, কিন্তু লোকের চোখে বড়ো হওয়া একটা নেশার মতো সেই শূন্যতাকে আড়াল করে দেয় প্রায়শই।

এককালে লোকের চোখে বড়ো হওয়ার উপায় ছিল বড়ো ব্রাহ্মণ হওয়া, কি বড়ো পণ্ডিত, বিদ্বান বা বিশেষজ্ঞ হওয়া। এই ছিল উন্নতির লোকায়ত প্যাটার্ন। এর জন্য প্রযুক্তি বা প্রাকৃতিক সম্পদের জোগান তত লাগে না। সেই সময়ে বড়ো রাজা বা বড়ো ব্যবসায়ী হতে গেলেও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার অবাধে করার সুযোগ ছিল না। গত আড়াইশো বছরে প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির সুবাদে ধনার্জনের দিক দিয়েও অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটছে এবং এই উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্য ব্যাকুলতা বেড়ে উঠছে।

শুধু প্রযুক্তিপ্রকরণের দ্বারাই তো আর ধন অর্জন হয় না, তাকে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া করিয়েই ধন অর্জন করতে হয়। এর ফলে উন্নতিসাধনা যে প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস ও বিকার ঘটাবে সেটাই স্বাভাবিক। মানুষের সংস্কারই যখন উন্নতির আদর্শে ভরা এবং সেই মানুষের কাছে যখন প্রযুক্তি সহজলভ্য তখন উত্তরোত্তর প্রাকৃতিক সম্পদের লুন্ঠন ও বিকৃতি অনিবার্য।

এখন অনেক মানুষই মনে করেন যে প্রযুক্তির কল্যাণে বস্তুগত উন্নয়ন চলতেই থাকবে। গ্রহান্তর থেকেও প্রাকৃতিক সম্পদের জোগান আসবে, জ্বালানির অসীম জোগান মিলে যাবে প্রযুক্তির যাদুমন্ত্রে। এইসব কারণে বস্তুচাহিদাকে মাপের মধ্যে রাখার চেয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের দিকেই তাঁরা জোর দিয়ে থাকেন বেশি। অথচ ইতিহাস বলে, একের পর এক যাদুকরী প্রযুক্তিগুলি আশির্বাদের পরে পরে এনেছে অভিশাপ। বড়ো বড়ো নদীপ্রকল্প সেচের জল এনেছে, কিন্তু বহু মানুষকে বাস্তুহারা করেছে, নদীকে পঙ্গু করেছে, কখনও বা অযথা বন্যা ঘটিয়েছে। সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষি উৎপাদন এক লাফে অনেক বেড়েছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মাটি বিষিয়ে যাচ্ছে, ভূগর্ভের জল দূষিত হচ্ছে আর তার স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। তাই প্রযুক্তির দৈবী শক্তির ওপর চোখ বুজে ভরসা রাখা আর যাচ্ছে না। গ্রহান্তরের কাঁচা মালই আসুক আর যত অবিশ্বাস্য প্রযুক্তিই আবিষ্কৃত হোক, ঠাটবাট বেড়ে চলতে থাকলে তার দায় মেটাতে প্রাকৃতিক সম্পদের যে ক্ষয় ও বিকৃতি বাড়তেই থাকবে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

একবার অভ্যস্ত হয়ে ওঠা ঠাটবাট থেকে নিচে নামা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অনেকটা একই অফিসে উচ্চতর পদ থেকে নেমে নিচু পদে কাজ করবার মতো দুর্বিষহ সেই পরিস্থিতি। ঠাটবাটের ক্রমোন্নতিকে যতই 'কাজের স্বীকৃতি'-র পরিচায়ক বা সেই জাতীয় কিছু-একটা বলে ধরে নেওয়া হোক-না কেন, ভিতরের কথাটি কিন্তু অন্য। বাইরের দিক থেকে পরিমাপযোগ্য উন্নতির ধারাটা বজায় রাখা সংস্কারের একটা দাবি। ঠাটবাটের ঊর্ধ্বগতি সেই সংস্কারচর্চায় সিদ্ধির এক পরিমাপ।

এই সংস্কারগুলির সামষ্টিক রূপ হল সংস্কৃতি। তাই একথা বললে

অত্যুক্তি হয় না — দেশেকালে যে উন্নয়নের দর্শন তা আমাদের সংস্কৃতির, আমাদের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ! উন্নতিকামনার আশ্রয়ে যে আদিম হিংসাবৃত্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যে অবাধ লুন্ঠন চতুর্দিকে চোখে পড়ে, তার প্রেরণা আছে আমাদের ঐতিহ্যের গভীরে।

এইখানে এসে একটা খটকা লাগতে পারে। আমাদের সংস্কৃতি কি শুধু আমাদের নিজেরটুকু গুছিয়ে নিতে বলে? স্বৈরাচারের ওপর বিবেকের অনুশাসন, দীনজনে দয়া করা, দুর্বলের রক্ষা করা, সার্বিক কল্যাণের আদর্শ, সর্বমঙ্গলের চেতনা — এগুলিও কি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ নয়! এই সুসংস্কৃতি দিয়েই না লোভ-হিংসা-স্বার্থপরতার অপসংস্কৃতির মোকাবিলা করতে হয়!

শুভ বা অশুভ — সংস্কৃতি যেমনই হোক, লোকে তার আশ্রয় নিয়ে থাকে সুরক্ষার আরাম পাবে বলে। সংস্কৃতির দুই ধারা যদি কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত করে, তার নিরসনও হয় সুরক্ষার বিচারে, অর্থাৎ কোন পথে নিরাপত্তা বেশি হবে সেই বিচারে। সেই পথই তখন সুপথ বলে মনে হয়। অবশ্য নিরাপত্তার হিসেবটা স্পষ্ট না হলে, অথবা নানাজনের হিসেব নানারকম হলে শুভ-অশুভ নিয়ে তর্ক উপস্থিত হয়।

সুসংস্কৃতি আর কুসংস্কৃতির ব্যাপারগুলির মধ্যে অনেক কিছু ধরে-নেওয়া থাকে। পেনাল্টি বাঁচানোর জন্য গোলকিপার আগে থেকে ঠিক করে রাখতে পারে, চোখ বুজে বাঁ দিকে অথব ডান দিকে ঝাঁপাব। একদিকে সু, অন্যদিকে কু। হয় ছক্কা নয় ফক্কা। কিন্তু চোখ বুজে ফেললে তার চলবে না। সংস্কারের আশ্রয়ে চলা মানেই চোখ বুজে ফেলা। সংস্কারের বশে মন টাটকা দেখা, নবীনসতেজ দেখা দেখতে পারে না। বর্তমানের সঙ্গে তার সংযোগ অসম্ভব হয়ে যায়।

জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে-কোন সঙ্কটের মোকাবিলা করতে গিয়েও তেমনি বিপত্তি হতে পারে। আশির দশকের মাঝামাঝি ভারত সরকার ঠিক করলেন, দূষিত গঙ্গার জলকে পুনরায় নির্মল করা দরকার। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান হল, প্রচুর টাকা বরাদ্দ হল। নদীর তীর বরাবর যে-সব কারখানা এবং পুরসভার নর্দমা থেকে দূষিত জল গঙ্গায় এসে পড়ে, তাদের সমীক্ষা হল। সেই দূষিত জল কী উপায়ে শুদ্ধ করা যেতে পারে, বিশেষজ্ঞরা তার পন্থা নির্দেশ করলেন। শহরের দূষিত জল শুদ্ধ করার জন্য নানাস্থানে বহু অর্থব্যয়ে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হল। কারখানাগুলিকে বাধ্য করা হল বড়ো বড়ো চৌবাচ্চা বানিয়ে জল শোধনের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু হইচই যত হল কাজের কাজ তত নয়। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আর পাইপলাইন বসানো বাবদ অর্থব্যয়ে পুরসভাগুলির যেমন উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, সেগুলিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে তত উৎসাহ দেখা গেল না। কোথাও কোথাও তো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছিল এমন স্থানে যে নর্দমার জলই সেদিকে গড়াতে উৎসাহ পেল না। যেটুকু সুব্যবস্থা হয়েছিল তাও বেশিদিন টিকল না। গঙ্গার জল নিয়ে শোরগোল কিঞ্চিৎ থিতিয়ে যাওয়ার পর কারখানার মালিক দেখলেন দূষিত জল শোধনের ব্যবস্থাটি চালু রাখতেও ঝামেলা আছে, খরচ আছে। শোধনের ব্যবস্থাটিকে বাইপাস করে অন্তত কিছু জল সরাসরি গঙ্গায় ফেললে একটু সাশ্রয় হয়। পরীক্ষামূলকভাবে দু-একবার তা করে দেখলেন কেউ সাড়াশব্দ করছে না। খোঁজ নিয়ে দেখলেন অন্য কারখানা মালিকরাও অনুরূপ পরীক্ষা করছেন। সাশ্রয়ের একটা রাস্তা খুলে গেলে তা নিয়ে দ্বিধা করা চলে না। এইসব বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সরকারের নজরদারির ব্যবস্থা আছে। আবার সেই নজরদারির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার উপায়ও কারখান মালিকের জানা আছে, তাতে কারখানা মালিক আর সরকারি পরিদর্শক — দুজনের কাউকেই এই দুর্মূল্যের বাজারে ভাতে মরতে হয় না।

এই ঘটনাক্রমের প্রতিটি ধাপেই সংস্কৃতির ভূমিকা লক্ষ্য করা যাবে। সরকারের উদ্যোগের পিছনে ছিল জনকল্যাণের আদর্শ, যা সুসংস্কৃতির অঙ্গবিশেষ। সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান সন্ধানে সরকার যোগ্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়েছিলেন, ঠিক যেমনটি হওয়ার কথা সুসংস্কৃতির আবহে। শোধনব্যবস্থার সুফল যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে তার জন্য পুরকর্তা, কারখানা মালিক বা সরকারি পরিদর্শককে দায়ী করা চলে না। তাঁরা সংস্কার অনুযায়ী উন্নতির পথেই চলেছেন, যে পথে না চললে তাঁদের নিশ্চয়ই কোন-না-কোনভাবে পিছিয়ে পড়তে হত। বিবেক বা ধর্মাধর্ম নিয়ে কোন সাময়িক গোলমাল যদি-বা হয়ে থাকে, সুসংস্কৃতির আশ্রয়েই তার সমাধানও থাকে। লক্ষ্মী গণেশ ইত্যাদি প্রহরী যাঁরা আছেন তাঁরা অবুঝ নন, সরকারি পরিদর্শকের মতো তাঁদের সঙ্গেও সমঝোতা সমন্বয়ে আসা যায়। কিয়োতো প্রোটোকলের ক্লিন ডিফেন্স মেকানিজমের মতো এক জায়গার ত্রুটি আর-এক জায়গার পুণ্য দিয়ে শোধন করার সুযোগ বরাবরই থাকে। তা না হলে লোকে কারবার করবে কীভাবে? মোটের ওপর, যা যা ঘটেছে সবই হয়েছে সংস্কারের আশ্রয়ে। গঙ্গার জলদূষণ নিয়ে কোন টাটকা সংবেদন এইসব দেওয়ানেওয়ার চৌহদ্দির মধ্যে ছিল না।

সুসংস্কার দিয়ে কুসংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে যুদ্ধটাই হয়। তাতে বড়ো জোর কিছু ধুলো উড়তে পারে, যোদ্ধার ইমেজের কিছু উন্নতি ঘটতে পারে। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি ছাড়া যে জিনিসটি যেমন তাকে তেমনভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ চেষ্টা করলেই যে সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া যায় এমন নয়। সংস্কার এক বর্মের মতো, তার ফাঁস ধরা থাকে নিরাপত্তাসন্ধানী মনের শক্ত মুঠিতে। সেই পেশি শিথিল না হলে ফাঁস খোলে না।

তবে নিরাপত্তার তাগিদই তো শেষ কথা নয়! কখনও কখনও সেই তাগিদ অন্তর্হিত হয়। সেই অবস্থা আমাদের অচেনা নয়। শিশু যখন একমনে খেলে, গণিতের জটের মধ্যে ছাত্র যখন ছন্দ দেখতে পায়, গায়ক যখন জগতের সুর কন্ঠে পায়, ভালোবাসা যখন নরনারীকে জগতের মাঝখানে জায়গা করে দেয়, সেই সেই মুহূর্তে তারা সকলেই সম্পূর্ণত বাস করে বর্তমানে। তখন না থাকে ভবিষ্যৎ, না থাকে নিরাপত্তার তাগিদ। তখন মনোযোগকে বর্তমান এতটাই টেনে নেয় যে এই সময়টুকু সংস্কার থেকে মন একেবারে মুক্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় থাকে শুধু সাদা চোখে চেয়ে দেখা। সে দৃষ্টিতে দ্রষ্টা জগৎ থেকে পৃথক নয়। তখন আমিই জগৎ, জগতই আমি — আমার মধ্যে কেবল সম্পর্কের প্রকাশ ঘটে, নিজেকে আলাদা করে দেখা যায় না। তখন তুলনা, প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত গোষ্ঠীগত যত সংগ্রাম সব অর্থ হারায় — সংস্কার অর্থ হারায়।

এই-যে অবস্থা , যাকে এই আলোচনায় সম্পর্ক নামে উল্লেখ করা হল, তার সঙ্গে নিরাপত্তাকামনার একটা উল্টো-রকম যোগ আছে। একটি থাকলে অপরটি উধাও হয়। একটি অবস্থায় দরজা-জানলা খুলে নিজেকে আঘাতের জন্য পুরোপুরি অবারিত করে ফেলা হয়, অন্যটিতে শক্ত করে অর্গল তোলা হয়। বস্তুত সম্পর্কের প্রতীক্ষা এবং নিরাপত্তার সন্ধান — এই দুই অবস্থার মধ্যে আমরা বিচরণ করে থাকি।

যে সম্পর্কের স্বাদ পেয়েছে একবার, যার আমি একবার জগতের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে স্বভাবতই চাইবে সেইরকম মুহূর্ত আবার আসুক। কিন্তু চেষ্টা করে সেই মুহূর্ত সৃষ্টি করা যায় না। চেষ্টায় পেশি শক্ত হয়। তা নিরাপত্তার অনুকূল হতে পারে, সম্পর্কের নয়।

দেহের মধ্যে একটি হাতের সঙ্গে আর একটি হাতের বিরোধ নেই। তুলনা নেই, প্রতিযোগিতা নেই। তেমনি আমিই যখন জগৎ, সেই অবস্থায় বিরোধ-হিংসা লোপ পায়। জগতের ক্ষতি আমার গায়ে বাজে। নিজেকে সরিয়ে নেওয়া যায় না। এলোমেলো আচরণ করা যায় না একটুও।

আমি যে জগৎ থেকে স্বতন্ত্র — এই ভাব এক মানসিক অবস্থা। আমিকে স্বতন্ত্র বলে জানলে আমি ও আমি-র বহির্গত এই দুই ভাগে জগৎ

ভাগ হয়ে যায়। তখন অন্যের সঙ্গে আমি-র নিত্য তুলনা ও প্রতিযোগিতা চলে। জগৎ থেক খাবলে খুবলে আমি-র উন্নতিসাধন চলে। এই প্রক্রিয়াটিই দূষণের গোড়ার কথা।

আমি সরকারের, পুলিশের, সমাজের, সংগঠনের বিবেক জাগানোর জন্য ভালো ভালো লেখা লিখব আর ভাষণ দেব, নিরিবিলিতে ব্যক্তিগত উন্নতিচর্চায় রত থাকব আর একদিন দূষণ দূর হয়ে যাবে, মাটি শস্যশালিনী হবে, মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ হতে থাকবে, নদীতে মিষ্টিজলের বান ডাকবে, এসব হবার নয়।

জীবনের সহজ সুখের জন্য, সহজ আনন্দের জন্য প্রচুর উন্নতি অর্জন করতে লাগে না। অথচ এই সুখের জন্যই, এই আনন্দের জন্যই মানুষ এইসব উন্নতিসাধনা করে চলেছে বলে মনে করে থাকে। কিন্তু উন্নতি অর্জনের কোন শেষ সীমা না থাকায় ব্যতিব্যস্ততা থেকে আমৃত্যু ছুটিও জোটে না তার। ক্রমশ সে প্রতিযোগিতায় ক্ষয়ে যায় এবং তার মানসিক দূষণ বাড়ে। সামাজিক ও পরিবেশ দূষণ আসে তার পিছু পিছু। এমন উন্নতির সাধনা যেন যে ডালে বসা সেই ডালই কেটে চলা।

দূষণের সঙ্কট আমাদের এক বিচিত্র দ্বন্দ্বের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। নিরাপত্তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কোন পথেই। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একার উন্নতিসাধনা করতে করতে জগৎ বিপন্ন হয়েছে, নিরাপদ থাকতে পারছি না কেউই। অথচ আমি-কে বিসর্জন দিতেও নিরাপত্তার সংস্কারে বাধে। আমার আগে আগে আর-সবাই যদি অস্ত্র সংবরণ করে ভূমায় লীন হয়ে যেত, আর আমিও এদিক ওদিক তাকিয়ে তাদের পিছু নিতাম, তাহলে গোল মিটে যেত। কিন্তু তা হবার নয়। বরং যদি সম্পর্কের মুহূর্ত আসে, পূর্ণ সংবেদন জাগে, তখন নিরাপত্তার প্রশ্নটাই থাকবে না।

মাথা হেঁট করে হেঁটে-চলা ওই জেলে, ওই ঝকঝকে স্পিডবোট, আকাশে উড্ডীন ওই কালো ধোঁয়া, গঙ্গার ঘাটে পরিত্যক্ত আশি বছরের ওই বৃদ্ধা, নদীপারের ওই ছেলেমেয়েদের দূরের উজ্জ্বলতার দিকে মুগ্ধ তাকিয়ে থাকা নিয়ে যে জীবন তার দিকে খোলা চোখে তাকানো যাক, দূষণ কী তা দেখা যাক।

উল্লেখপঞ্জি

১ http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/arseicsum.pdf

২ http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr52/en/index.html

৩ http://www.envfor.nic.in/legis/noise/noise.html

৪ http://www.ggdc.net/Maddison

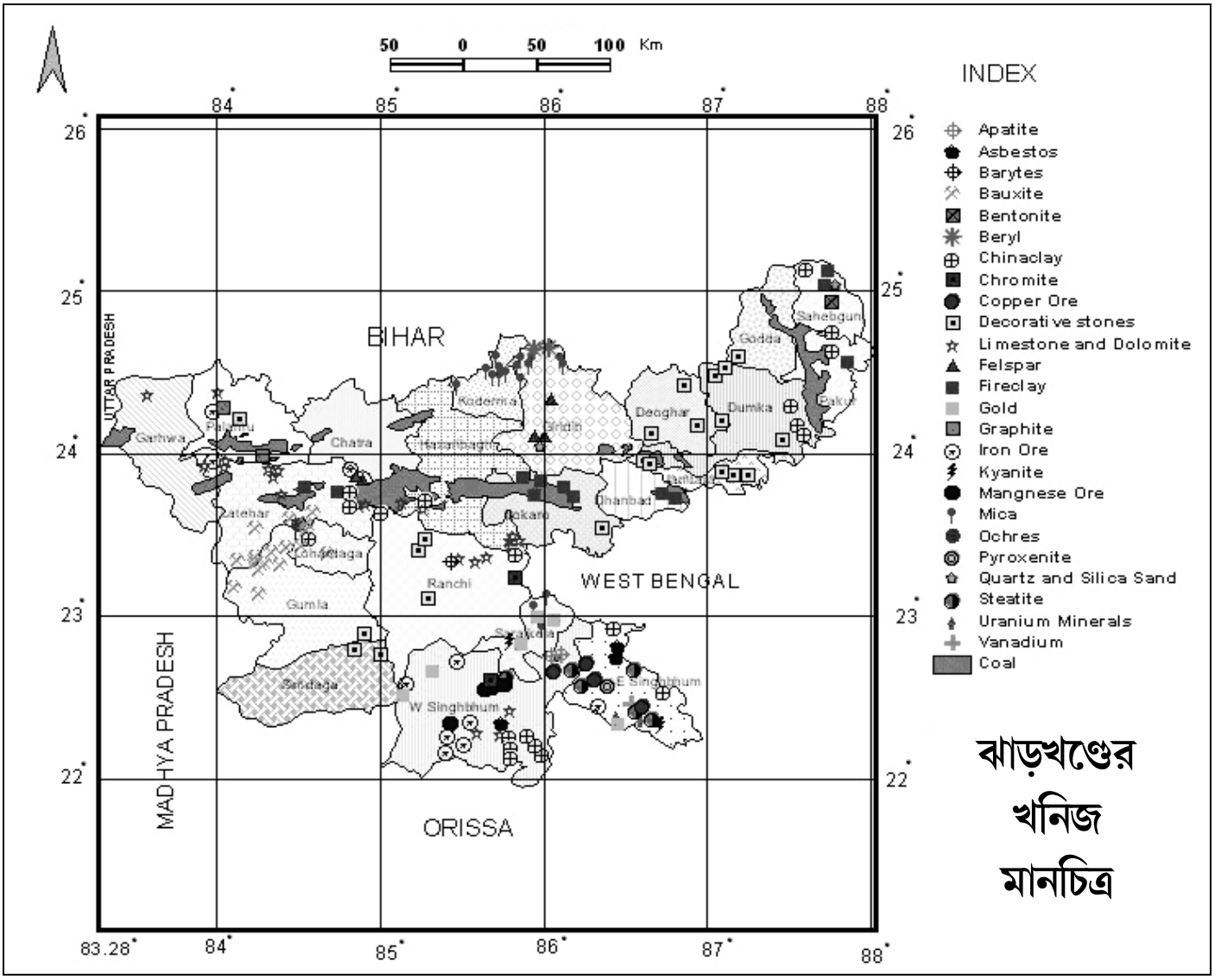

ঝাড়খণ্ডে খনিজ শিকার

প্রশান্ত হালদার

ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীরা যখন জঙ্গলে শিকারের জন্য যায়, তাকে বলা হয় 'ছুলওয়া'। এইসময় কেন্দ্রীয় সরকারও দেশের মধ্যভাগে এমনই এক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা একে 'অপারেশন গ্রিন হান্ট' নামে জানতে পারছি। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কখনও এই নামকরণ স্বীকার করছে, কখনও আবার তা অস্বীকারও করছে। কারণ খনিজ সম্পদে ভরপুর এক বিশাল অঞ্চল (মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড নিয়ে এই খনিজ অঞ্চল) এর সীমানা। এই অঞ্চলের ওপর সরকারি দখলদারি কায়েম করা এর লক্ষ্য, যকে সরকারি পরিভাষায় 'আইনের শাসন' কায়েম করা বলা হয়। তাই একে 'মিনারেল হান্ট' বা 'খনিজ শিকার' বললে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ হত এবং নামকরণের সমস্যাটাও মিটে যেত। যাই হোক, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং আগেই উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যখন তিনি বলেছিলেন, ''খনিজ অঞ্চলের পুঁজি বিনিয়োগে কোনরকম বাধাদান বরদাস্ত করা হবে না'' বা যখন উনি বলেন, ''প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর অঞ্চলে যদি বামপন্থী উগ্রপন্থা চলতে থাকে, তাহলে (পুঁজি) বিনিয়োগের পরিবেশে নিশ্চিত রূপেই খারাপ প্রভাব পড়বে''। এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়, আসলে উদ্দেশ্যটা খনিজ শিকার, তার জন্যে বামপন্থী চরমপন্থীদের (মাওবাদীদের) নিকেশ করার অভিযান।

আশ্চর্যজনকভাবে ভারতীয় শিল্পপতিদের সংগঠন 'ফিকি' (FICCI) একই কথা বলেছে তাদের রিপোর্ট 'টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট অন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড টেররিজম'-এ। এতে বলা হয়েছে, 'নকশালরা ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধির অদৃশ্য শত্রু। ভারতীয় কোম্পানি, বিদেশি বিনিয়োগকারি এবং রাজ্যগুলির পক্ষে দূষণ, ভঙ্গুর পরিকাঠামো ও রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্ব যত না ক্ষতিকর, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করার ক্ষমতা নকশালদের রয়েছে। খনিজ সম্পদে ভরপুর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে ক্রমবর্ধমান মাওবাদী বিদ্রোহ বহু শিল্পের বিনিয়োগে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে। যখন ভারতীয় শিল্পের বিকাশের জন্য সমন্বয় সাধন দরকার এবং বিদেশি কোম্পানিগুলি এই কাজে যুক্ত হচ্ছে, তখন ভারতের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের সহায়ক খনিজ ও ইস্পাত কোম্পানিগুলিকে নকশালরা তাড়িয়ে দিচ্ছে। ... যে কোম্পানিগুলি এই অঞ্চলে বিনিয়োগের কথা ভাবছে, তাদের বড়ো বেশি ঝুঁকি নিতে হচ্ছে এবং বিনিয়োগের পরিবেশটা নষ্ট হচ্ছে।'' (অনীক, মার্চ ২০১০)

পুঁজিপতিদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কর্পোরেট মিডিয়াও চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। সরকারি বিজ্ঞাপন, মিথ্যা খবর এবং বিভিন্ন বিবৃতির মাধ্যমে ওই বক্তব্যকে তারা পুষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের পরিবেশকে উন্নত করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নকশালপন্থাকে লোপাট করে দেওয়ার কাজে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাস্তব ঘটনা হল, এই অঞ্চলের গ্রাম ও আদিবাসী সমাজ বড়ো বড়ো কোম্পানির দখলে নিজেদের জমি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে জবরদস্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে, এর মধ্যে কোথাও কোথাও মাওবাদীদের সহযোগিতাও রয়েছে। কোথাও কোথাও মাওবাদীদের প্রভাব প্রশাসনকেও বড়ো রকমের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আজ এদের সবাইকে বিনিয়োগের বাধা হিসেবে মনে করা হচ্ছে। অতএব এদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সরকার যুদ্ধে নেমে পড়েছে। প্রায় ৭৫০০০ সশস্ত্র ফৌজ মোতায়েন করা হয়েছে। বিমানবাহিনীকেও মোতায়েন করা হয়েছে। দেশ-বিদেশের বহু নামি বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার ও সমাজকর্মী একে নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে নিন্দা করছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে তাঁরা এই যুদ্ধ বন্ধ করার আবেদন করেছেন।

পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতি

আসলে ময়দানে নেমে পড়ার অনেক আগে থেকেই এই যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২০ ডিসেম্বর ২০০৭ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এক বৈঠকে তাঁদের সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মাওবাদীদের 'দেশের নিরাপত্তার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বিপদ' হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই মন্তব্যের তাৎপর্য ছিল পরিষ্কার। এর ইঙ্গিত ছিল এটাই যে, বিষয়টা রাষ্ট্রীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। কেবল রাজ্যগুলির সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে এর মোকাবিলা সম্ভব নয়, বরং কেন্দ্রীয় বিশেষ সশস্ত্র বাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নেওয়া হল। এরপর তো তিনি এই মন্তব্য বারবার আওড়াতে থাকলেন, অর্থাৎ আগামী পদক্ষেপের ভিত তৈরির কাজ করতে থাকলেন। তাঁর কথা অনুযায়ী, ''বেশ ক'টি রাজ্যে ওরা (মাওবাদীরা) স্থানীয় সংঘর্ষ, জমির বিরোধ এবং অন্যান্য অধিকারের প্রশ্নে ঢুকে পড়ছে। ... ওরা বেছে বেছে পরিবহণ, যোগাযোগ ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে টার্গেট করছে। তার ফলে উন্নয়নের গতি আটকে যাচ্ছে। এই ভাইরাসকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। এই কাজে স্বরাষ্ট্র দপ্তর পুরোপুরি সহযোগিতা করবে ঠিকই, তবে রাজ্যগুলির যৌথ অভিযান ও যৌথ কার্যকলাপের কথা ভাবতে হবে''। এইভাবে এখনকার কেন্দ্রীয় অভিযানে রাজ্যগুলিকে শামিল করার প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল।

২৬ নভেম্বর ২০০৮ মুম্বই কাণ্ডে জনমনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তাকে আশ্চর্যজনকভাবে মাওবাদী এবং জন-আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হল। ওই ঘটনার জন্য প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানকে দোষী সাব্যস্ত করা হল এবং মার্কিন নাগরিক হেডলিকে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী মনে করা হল। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে দেশের ভেতর নিরাপত্তার বিষয়ে কড়াকড়ির পদক্ষেপ নেওয়া হল। দেশের মধ্যে 'বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন ২০০৮' (Unlawful Activities Prevention Act) নতুন কিছু সংশোধনী সমেত লাগু করা হল। এই আইনে যেসব মানুষকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাদের অধিকাংশ হয় জন-আন্দোলনের কর্মী, নয়ত মাওবাদী বা তাদের সহযোগী বলে কথিত। এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গের লালগড়ে জন-আন্দোলনের নেতা ছত্রধর মাহাতো ইত্যাদিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মুম্বই কাণ্ডের পর ৩০ নভেম্বর ২০০৮ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাতিলকে সরিয়ে দিয়ে মনমোহন সিংয়ের পছন্দের লোক বলে পরিচিত পি. চিদাম্বরমকে ওই মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মাওবাদীদের বিষয়ে শিবরাজ পাতিলের মত ছিল, পুলিশি কার্যকলাপ এবং উন্নয়নের কাজ পাশাপাশি চলুক। পি. চিদাম্বরম স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার নেওয়ার পর বলতে শুরু করেন, ''এটি একটি ছেলেমানুষি মনোভাব যে পুলিশি কার্যকলাপ এবং উন্নয়ন একসঙ্গেই চলতে পারে। উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু তখনই তা সম্ভব যখন পুলিশি কার্যকলাপের মাধ্যমে অঞ্চলকে সুরক্ষিত করে ফেলা যাবে'' (২১ মার্চ ২০০৯, টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া)।

কেবল এটুকুই নয়, এরপর দেশের সমস্ত থানাকে 'ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সিস্টেম'-এর অধীনে নিয়ে আসা হচ্ছে। এর জন্য ২০০৭-২০১২ দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ লক্ষ কোটি টাকার খরচ ধরে নেওয়া হয়েছে। পি. চিদাম্বরমের বক্তব্য অনুযায়ী, এটা

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন। ১৯ জুন ২০০৯ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আর্থিক বিষয়ের ক্যাবিনেট কমিটিতে এই বরাদ্দ স্বীকৃতি পায়। এইসব পদক্ষেপের মাধ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি আগে থেকে চলছিল। (ইন্ডিয়া জার্নাল, ২০ জুন ২০০৯)

চীনের পথ আমাদের পথ

এই যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত পুঁজিপতিদের স্বার্থ সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। প্রকৃতপক্ষে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্ববাজারে খনিজ ও ধাতুর চাহিদা ও দাম বেড়ে গিয়েছিল। এর ফলে পুঁজিপতিরা খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। ২০০০–২০০৫ সালের মধ্যে বিশ্ববাজারে আকরিক লোহার দর ১১৮.৫%, তামার দর ১৩৬%, দস্তার দর ১১৬%, নিকেলের দর ১১৮% এবং অ্যালুমিনিয়ামের দর ৪১% বেড়ে গিয়েছিল। এ থেকে খনিজ উৎপাদনের জন্য পুঁজিপতিদের লালসা সহজেই অনুমান করা যায়।

খনিজ পদার্থের এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য চীনের ভূমিকাই মুখ্য বলে মেনে নেওয়া হয়। স্টিল উৎপাদনে চীন গত এক দশকে বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে। চীনে স্টিলের উৎপাদন এতটাই বেড়ে গেছে যে, আকরিক লোহার যোগান ওই দেশের নিজস্ব উৎপাদন থেকে সম্ভব নয়। যদিও আকরিক লোহার উৎপাদন সেখানে প্রচুর। অতএব তাদের অন্য দেশ থেকে আকরিক লোহা আমদানি করতে হচ্ছে। ২০০০–২০০৪ সালের মধ্যে চীন বিশ্বের মোট আকরিক লোহার উৎপাদনের দুই–তৃতীয়াংশ উৎপন্ন করেছে। এইভাবে অন্য ধাতুশিল্পের কাঁচামালের জন্য বক্সাইট, তামা, নিকেল, জিঙ্ক ইত্যাদি খনিজেরও যোগান তার দরকার। খনিজের এই চাহিদার ফলে বর্তমানে বিশ্বের খনিজ বাজারে চাহিদা ৩০০ শতাংশ বেড়ে গেছে এবং মুনাফার হার আট গুণ বেড়ে গেছে।

চীনের দেখানো রাস্তায় জিন্দাল, মিত্তাল, এসার, বেদান্ত, টাটার মতো কোম্পানি ভারতের মাঠে নেমে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে চীনের চাহিদা পূরণের জন্য এবং সেখানকার ইস্পাতশিল্পকে মোকাবিলা করার জন্য ভারতেও এইসব ক্ষেত্রের বিনিয়োগে তেজিভাব দেখা দিয়েছে। ১৯৯৩–৯৪ সালে যেখানে ২৫০০০ কোটি টাকার খনিজ উৎপাদন হয়েছে, সেখানে ২০০৫–০৬ সাল পর্যন্ত তা বেড়ে ৮৪০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়েছে তিন গুণ। বিশ্বের খনিজ বাজারে সৃষ্টি হওয়া এই ব্যবসা স্ফীতি থেকে সহজেই আন্দাজ করা যায় যে, পুঁজিপতিরা এর থেকে কীভাবে মুনাফা কামিয়েছে। এখন সেই পুঁজিপতিরা আরও মুনাফার জন্য ছটফট করছে আর আমাদের সরকার তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন। সময়টা এতই পাল্টেছে যে, একসময় নকশালেরা বলত, 'চীনের পথ আমাদের পথ' আর আজ আমাদের সরকার এবং পুঁজিপতিরা চীনের পথ অনুসরণ করার জন্য নকশালদের নিকেশ করার আয়োজনে ব্যস্ত! এই পট পরিবর্তন কি তবে বিশ্বায়নের ফল?

বিশ্বের পুঁজিপতিদের মধ্যে যেমন নিজের নিজের মাল বিক্রির জন্য জবরদস্ত প্রতিযোগিতা চলে, তেমনি তারা নিজের নিজের ব্যবসার বিস্তারের জন্য বিনিয়োগের নতুন নতুন এলাকারও ব্যাপক খোঁজ চালাতে থাকে। আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন, যেমন খাদ্য, জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির বাণিজ্যিকীকরণ চলছে। এবার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিজেদের দখলদারি বাড়িয়ে নিয়ে এই পুঁজিপতিরা নিজেদের ব্যবসার বিস্তার ঘটাতে চাইছে। অনুরূপভাবে আমাদের সরকারও দেশের খনি আইন সংশোধন করে ওদের বিনিয়োগের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। ওরা বেশি বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করে বেশি বেশি মুনাফা করতে চায়। এতে কোনরকম বাধা বরদাস্ত নয়। এই মুনাফার তাগিদেই ওরা আজ সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

লক্ষ্য ঝাড়খণ্ড

ওপরে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের শিকার নবগঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্য, সেও এখন অপারেশন গ্রীন হান্টের লক্ষ্য। পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা চব্বিশটি জেলা নিয়ে তৈরি ছোটোনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলকে বলা হয় ঝাড়খণ্ড রাজ্য।

এখানে পুরো এলাকা জুড়েই অসংখ্য নালা এবং পাহাড়ি ঝর্ণার জাল বিছানো রয়েছে। দামোদর, বরাকর, কোয়েল, কারো, সুবর্ণরেখা, বৈতরণী, ময়ুরাক্ষী, অজয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য নদীগুলি এখানে জলের প্রাচুর্য্যের সাক্ষী। এই রাজ্য খনিজ সম্পদে ধনী রাজ্যগুলির অন্যতম। দেশের মোট খনিজ সম্পদের ৪০ শতাংশ এখানেই রয়েছে। এর মধ্যে ইউরেনিয়াম, আকরিক লোহা, তামা, সোনা, রূপা, বক্সাইট, ফায়ারক্লে, কোয়ার্টজ, ফেল্ডস্পার, মাইকা, গ্রানাইট, ম্যাগনেটাইট, ডলোমাইট, কয়লা ইত্যাদি রয়েছে।

১৮৫৬ সালের কাছাকাছি ঝরিয়া, বেরমৌ ও করণপুরা কয়লা অঞ্চলের বিকাশ হয় আর কয়লা খননও শুরু হয়। ১৯০৭ সালে সিংভূম জেলার জামশেদপুরে টাটা ইস্পাত কারখানার নির্মাণের মধ্যে দিয়ে লৌহ আকরিকের খননও শুরু হল। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দেশের মোট খনিজ উৎপাদনের ২৭.৭৭% এখান থেকেই হত।

সরকারি হিসেব মতো, ঝাড়খণ্ডের ৭৫.৫ লক্ষ হেক্টর ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে ২৩.২ লক্ষ হেক্টর অরণ্য, শতাংশের হিসেবে মোটের প্রায় ২৯%। দেশের মধ্যে এটা সর্বাধিক, এখানে ধারাবাহিকভাবে জঙ্গল হ্রাস পাওয়ার পরেও এটা রয়ে গেছে। ভারতীয় জঙ্গল সংরক্ষণ রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে তিন বছরে এখানে প্রায় তিন লক্ষ হেক্টর জঙ্গল হ্রাস পেয়েছে। কেবল সিংভুম জেলাতেই ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯–এর মধ্যে ৩২০০ হেক্টর বনভূমি হ্রাস পেয়েছে। যেখানে সারান্ডার ঘন শালবন পুরো এশিয়ায় বিখ্যাত ছিল। জল জঙ্গল এবং খনিজ সম্পদে ভরপুর ঝাড়খণ্ড চিরকালই পুঁজিবাদের লুন্ঠনের কেন্দ্র হিসেবে ছিল। এখনকার এই নয়া তীব্র হামলাই চর্চার বিষয়।

নতুন রাজ্যে নতুন হামলা

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৫ নভেম্বর ২০০০ আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্য স্থাপিত হল। মানুষের মনে আশা জাগল, এবার আপন উন্নয়নের অধিকার নিজেদের হাতে আসবে। নিজেদের মতো করে বাঁচবার রাস্তা পাওয়া যাবে। এই ছিল ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ভাবনা। শীঘ্রই সেই আশা চূর্ণ হল। নতুন রাজ্য তৈরি হওয়ার তিনমাস পরেই ২ ফেব্রুয়ারি ২০০১–এ কোয়েলকারো নদীর ওপর বাঁধ তৈরির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ৫ বছর ধরে আন্দোলনরত গ্রামবাসীদের ওপর গুলি চালায় ঝাড়খণ্ড পুলিশ। ৮ জন মারা গেছিল, ২০ জন আহত হয়েছিল। বাবুলাল মারান্ডি সরকার ক্ষমতায় এসেই বড়ো বড়ো দেশি–বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে শিল্পস্থাপনের চুক্তি সেরে ফেলল। অর্জুন মুন্ডা সরকার এসে এইসব চুক্তির পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে ফেলল। লোকে এইসব চুক্তির আসল স্বরূপ জানতেও পারল না, আর তাদের তা জানানোও হল না। জনতার নির্বাচিত সরকার পুঁজিপতিদের সাথে চুপিচুপি সমঝোতা করে নিল। এর বিবরণ প্রকাশ হল না। মানুষের কোনও অংশগ্রহণও রইল না। এগুলিকে বলা হয় 'মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং' বা সংক্ষেপে মৌ। লোকে এই শব্দের সঙ্গে আদৌ পরিচিত ছিল না। একে একে এই চুক্তির সংখ্যা ১০৩ অবধি পৌঁছে গেল। ঝাড়খণ্ডের রাজনীতির পালাবদলে কিন্তু চুক্তির কোনও বিরাম নেই। মুখ্যমন্ত্রী পাল্টাতে থাকল, চুক্তি বাড়তে থাকল। বাবুলাল মারান্ডি ৪, অর্জুন মুন্ডা ৫৪, মধু কোড়া ১৯, শিবু সোরেন ২৬টি চুক্তি করেন। এই চুক্তিগুলির মধ্যে স্টিল, স্পঞ্জ আয়রণ, বিদ্যুৎ এবং সিমেন্ট কারখানাই

বেশি। এর মধ্যে রয়েছে টাটা, মিত্তাল, জিন্দাল, এসার, ভূষণ, যে এস ডব্লু, হিন্ডালকো, জে এস পি এল, অভিজিত গ্রুপ ইত্যাদি। ৪৬৭২৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে এরা মোট ২০০০০০ একর জমি হস্তগত করবে এবং তাতে আনুমানিক ১০ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

যেসব কোম্পানি শিল্পস্থাপন করবে, তাদের দরকার জমি, খনিজ আর জল। ঝাড়খণ্ড সরকার এই চক্রান্তে শামিল হয়েছে। তারা আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিয়ে ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক তৈরির কাজ শুরু করেছে। অন্যদিকে পুঁজিপতিদের পছন্দ মতো জমি কেনার সরকারি ছাড়পত্র দিয়ে রাখা হয়েছে, তাকে সরকার সহযোগিতা করছে। মূল্যবান খনিজ উত্তোলনের জন্য ইতিমধ্যে ৫২৪টি লিজ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কেবল কয়লার জন্যই ২০৬টি লিজ বন্টন করা হয়েছে। এছাড়া, হালকা খনিজদ্রব্যের খননের জন্য ৮৪২৬ হেক্টর জমিতে ২৭১৭টি লিজ মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রাইভেট মালিকদের হাতে খনির মালিকানা সঁপে দেওয়ার পর খনিজ উৎপাদনে ব্যাপক বৃদ্ধি শুরু হয়। ২০০৪–০৫ সালে প্রায় ৫৭৬০ কোটি টাকার খনিজ উৎপাদন হয়েছে, এটা দেশের মোট খনিজ উৎপাদনের মূল্যের ৮%। ২০০৮–০৯ আর্থিক বছরে মোট ৯৭৩০ কোটি টাকার খনিজ উৎপাদন হয়েছে, অর্থাৎ চার বছরে প্রায় দু হাজার কোটি টাকার খনিজ উত্তোলন বেড়ে গেছে, যা প্রায় ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি। এছাড়া, অবৈধ খনি থেকে উত্তোলিত খনিজের দাম তো হিসেবের মধ্যে আনা সম্ভব নয়। যদিও এই খনিজ লুঠ দিনের আলোর মতোই সত্য। এর ফলে ২০০১ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে প্রায় ৭৯০০ হেক্টর জঙ্গল ধ্বংস হয়েছে। সেই এলাকায় বিগত কয়েক বছর যাবৎ বৈধ ও অবৈধ আকরিক লোহার খনির বিস্তার ঘটেছে। নদীর জল ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা এবং তার ওপর বাঁধ দেওয়ার ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছে। শিল্পগুলিকে জল সরবরাহ করার জন্য ঝাড়খণ্ড সরকার বুন্ডু ব্লকের গিতিলটিহ গ্রামের কাছে রায়সা নদীর ওপর বাঁধ বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে ১১১৬০০০ বর্গমিটার জমি লাগবে। বাঁধ ১৬০ ফুট উঁচু হবে। সারা বছর ১৪৩ ফুট জল থাকবে। এতে বিনিয়োগ হচ্ছে ৫২২৬৮০৭০০ টাকা। গ্রামবাসীরা এই পরিকল্পনার প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করেছে, সরকারকে চুক্তি করতে হবে বাঁধের ৮০% জল সেচের জন্য ব্যয় করতে হবে। বিক্ষোভ আন্দোলনে এখন কাজ বন্ধ আছে। কোথাও কোথাও জলের উৎসটাও কোম্পানিদের হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে। আসলে চুক্তি বা সমঝোতার বয়ান গোপন রাখার ফলে পুরো মতলবটা এখনও জনসমক্ষে আসেনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিগত ষাট বছরে যত প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হয়েছে আর যত মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে, আগামী পনেরো বছরেই তার অনেক বেশি পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠন হবে এবং আরও বেশি মানুষ উচ্ছেদ হবে।

পুরনো কথা, আজকের প্রেক্ষাপটে

বিগত দেড়শ বছর ধরে ঝাড়খণ্ডের মানুষ উচ্ছেদের আক্রমণ সহ্য করে আসছে। ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা এই ধারা পরবর্তীকালেও স্তিমিত হয়নি। এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করে ব্রিটিশ শাসকরা আদিবাসীদের তাড়ালো। তাদের পাঠানো হল আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানে। আরম্ভ হল উচ্ছেদের যাত্রা, যা এখনও অব্যাহত। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, যেমন শিল্প, খনি, বাঁধ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য ১৯৫০ থেকে ১৯৯৫–এর মধ্যে যত লোক উচ্ছেদ হয়েছে, খুব বেশি হলে তার ২৫% যেমন–তেমন একটা পুনর্বাসন পেয়েছে। বাকি ৭৫% লোক কোথায় গেছে, কেউ জানে না। এদের মধ্যে ৭০ থেকে ৮০% ছিল আদিবাসী। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, এই সময়ের মধ্যে ১৭১০৭৮৭ জন মানুষকে উচ্ছেদ করে ২৪১৫৬৯৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নেওয়া জমির ৩৪.৪% গেছে কয়লা খনিতে। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫–র মধ্যে কয়লা খনির জন্য ১৮০০০০ মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে, এর মধ্যে মাত্র ১১৯০১ জনকে কয়লা কোম্পানিগুলি চাকরি দিয়েছে। এর আগে বোকারো ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য ১২৪৮৭টি পরিবারকে উচ্ছেদ করে ৩৪২২৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এখানে মাত্র ১৫–২০% স্থানীয় মানুষের চাকরি হয়েছিল। একইভাবে রাঁচী হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা স্থাপনের জন্য ১২৯৯০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করে ৯২০০ একর জমি নেওয়া হয়েছিল। এখানেও নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। কেবল তাই নয়, এই প্রকল্পে ব্যবহার না হওয়া ৩৫০০ একর জমির মধ্যে ১৫৮ একর ইদানীং ওই কোম্পানি একর প্রতি ৫৮ লক্ষ টাকায় সিআইএসএফ–কে বিক্রি করেছে। এইভাবে অধিগৃহীত জমির ব্যবসা করার বিরুদ্ধে আগেকার জমির মালিকেরা আন্দোলন করছে। তাদের যুক্তি হল, কোম্পানি যে জমি ব্যবহার করতে পারেনি, সেটা ফেরত দেওয়া উচিত।

১২০টি গ্রামের ৪৩৫০০ একর জমি ডুবিয়ে তৈরি চান্ডিল বাঁধ–এর জল কিন্তু কেবল টাটানগরী এবং ইস্পাত কারখানার জন্য। ৩৭০০ লোককে উচ্ছেদ করে মশান জলধারার (ম্যাসেনজোর) ব্যবহার তো পশ্চিমবাংলার জন্য। ৯৩, ৮৭৮ মানুষকে উচ্ছেদ করে বানানো পাঞ্চেৎ আর মাইথন বাঁধ ডিভিসি–র জন্য। তেনুঘাটের জল যায় বোকারো স্টিল সিটিতে। জামশেদপুর ও বোকারো শিল্পনগরী ঝলমল করছে। রাঁচী, ধানবাদের মতো শহরেরও জেল্লা বাড়ছে। বাঁধ এবং জলাশয়ের জন্য ৫০,০০০ হেক্টর জমি উৎসর্গ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য হাজার হাজার একর জমি নেওয়া হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের গ্রাম রয়েছে অন্ধকারে ডুবে, খেত রয়েছে শুকিয়ে। ২০০৬–০৭ পর্যন্ত রাজ্যের ২৯,৪৫৫ টা গ্রামের মধ্যে ৯২৪৩ গ্রামে (৩১%) বিদ্যুৎ এসেছে। কৃষিজমির মাত্র ৯% সেচসেবিত। যদিও ৮৫% মানুষই চাষ নির্ভর। এটা সরকারি তথ্য, বাস্তব চিত্রটা আরও খারাপ। ঝাড়খণ্ড যেমন অনুন্নয়নের জন্য উপেক্ষিত, তেমনই উন্নয়নের ভ্রান্ত পুঁজিবাদী দিশার জন্য শোষিতও বটে। এর কুফল সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছে আদিবাসীরা।

এইসব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী জনসংখ্যা ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে চলেছে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, এখানকার মোট জনসংখ্যার ২৬.৩% আদিবাসী। অথচ কিছু সমালোচকদের মতে, ১৯৪৭ সালের আগে এখানে ৫০%–এর বেশি আদিবাসী ছিল। ১৯৫১–তে যখন ঝাড়খণ্ড বিহারের অন্তর্গত ছিল, বিহারের মোট জনসংখ্যার ৩৬.৮১% ছিল আদিবাসী। ১৯৯১ সালে কমে গিয়ে তা ২৭.৬৬%–এ নেমে এসেছিল। আদিবাসী জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারেও বেশ নিম্নগতি লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৯১ সালে যেখানে বৃদ্ধির হার ছিল ২৩.৩%, ২০০১–এ তা কমে হয়েছিল ১৭.৩%; অর্থাৎ ঘাটতির হার ছিল ৬%। মোটের ওপর, উচ্ছেদ এবং জঙ্গল ধ্বংসকে এই ঘাটতির মুখ্য কারণ হিসেবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

উন্নয়ন না লুঠ!

পুঁজিপতিদের সঙ্গে করা সমঝোতাকে সরকার বলছে উন্নয়ন। কর্পোরেট মিডিয়াও সেটাই বোঝাচ্ছে এবং মানুষকে জমি দিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। মানবিকতার দোহাই দিয়ে স্কুল, হাসপাতাল, ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদির কথা সামনে নিয়ে আসছে।

'আদিবাসী মূলবাসী অস্তিত্ব রক্ষা সমিতি'র পতাকাতলে খুঁটি ও গুমলা জেলায় আর্সেলর মিত্তাল কোম্পানির বিরুদ্ধে যে জবরদস্ত প্রতিরোধ

আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার সংগঠক দয়ামণি বারলা বলেছেন, ''স্কুলে কে পড়বে? নিজের জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ, নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষ না নিজের রোজগার নষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষ? যার পেটে দানাপানি নেই, সে কীভাবে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যাবে? খিদের জ্বালায় যারা ছটফট করছে, তাদের কীসের ট্রেনিং দেওয়া হবে? এরা ঝাড়খণ্ডের মঙ্গল করবে, এটা মিথ্যে কথা! আসল কথা, এরা ব্যবসা করবে, মুনাফা কামাবে।''

যেসব শিল্পের জন্য চুক্তি হয়েছে, তার অধিকাংশ হল স্পঞ্জ আয়রন কারখানা, স্টিল ফ্যাকট্রি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর হল স্পঞ্জ আয়রন কারখানা। বিভিন্ন দেশে এই কারখানা স্থাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী, একশ টন স্পঞ্জ আয়রনের উৎপাদন করার জন্য ২৫০ টন বর্জ্য নির্গত হয়। এই বর্জ্য খালাস করার ফলে আশপাশের পুকুর বা নদীর জল বিষাক্ত হয়ে যায়। চালু স্পঞ্জ আয়রন কারখানার আশপাশে সশরীরে গেলে ছবিটা স্পষ্ট বোঝা যায়। গাছপালা, খেত, ঘরদোর সব কালো ঝুলকালিতে ঢেকে যায়। স্থানীয় মানুষ নানা খারাপ অসুখে ভুগতে থাকে। এই কারখানা দূষণ ছাড়া আর কিছুই স্থানীয় জনসমাজকে দেয় না। সাধারণ মানুষের এতে কোন লাভ নেই, এ থেকে ইস্পাত তৈরির কাজ হয়।

এই কারখানার এত রমরমা এই জন্যই যে, এতে মালিকদের বিপুল মুনাফা। একশ টন উৎপাদন-ক্ষমতার একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা খুলতে ৭ থেকে ১২ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। তাতে মাসিক ৬০ লক্ষ টাকা মুনাফা হয়। ফলে বছর না ঘুরতেই বিনিয়োগের টাকাটা উঠে আসে। এরপর কেবল মুনাফা আর মুনাফা। মুনাফা লোটার এমন ছাড়পত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে? 'লোহা গরম হ্যায়' নামক তথ্যচিত্রে পরিচালক মেঘনাদ এই তথ্য পেশ করেছেন।

চুক্তিগুলিতে স্টিল ফ্যাকট্রির দারুণ রমরমা। জামশেদপুরের টাটা স্টিলের উদাহরণ চোখের সামনেই রয়েছে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ফিনান্সিয়াল টাইম্‌স পত্রিকা থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৯১ সালে এখানকার ৮৫০০০ কর্মী দশ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরি করেছে, তার মূল্য ছিল ৮ লক্ষ ডলার। ২০০৫-এ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছিল পঞ্চাশ লক্ষ টনে। এর মূল্য ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ ডলার। কিন্তু সেখানে কর্মীসংখ্যা কমে ৪৪০০০ হয়ে গিয়েছিল। উৎপাদন পাঁচগুণ বাড়লেও কর্মসংস্থান অর্ধেক হয়ে গেল। উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শ্রম-উৎপাদনশীলতা দশগুণের বেশি বাড়িয়ে নেওয়া হল। শ্রম-উৎপাদনশীলতার কয়েক গুণ বৃদ্ধি এবং শ্রমিক ও বেতনের সেইমতো বৃদ্ধি না হওয়ায় মুনাফার হার বেড়ে যায়।

প্রস্তাবিত ইস্পাত প্রকল্পে চাকরির নামে সেই লোকেদেরই নিয়োগ হবে, যারা মুনাফার জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত; যাদের বিশ্ববাজারের চাহিদা অনুযায়ী যোগ্যতা রয়েছে। এমএ, বিএ ডিগ্রির এখানে কোন মূল্য নেই। উন্নয়নের এই মডেল দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হারকে উপরে তুলতে পারে সত্যি, কিন্তু একই সঙ্গে তা অসাম্য ও বেকারিকেও বাড়িয়ে দেয়। অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ির মত অনুযায়ী, ''এটা কেবল অসাম্য এবং তার বৃদ্ধির বিষয় নয়, আসলে এটা তার থেকেও অনেক ভয়ানক বিষয়। উন্নয়নের নামে গরিবের সঙ্গে কপটতা করা একধরনের উন্নয়নপন্থী সন্ত্রাস।'' যেটা আজকাল জমি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য আকছার করা হচ্ছে। জলের দরে জমি কিনে নিয়ে, কাঁচামালের খনির ওপর কব্জা করে, মাগনায় জলের ব্যবহার করে অর্বুদ-কোটি টাকার বাণিজ্য লুঠ ছাড়া আর কী?

'তহলকা' সাপ্তাহিকের ৩ এপ্রিল ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অনুসারে কর্নাটকে আকরিক লোহার ব্যবসায়ীরা সরকারকে টন প্রতি ২৭ টাকা রাজস্ব দিয়ে সেই লোহা টন প্রতি ৭০০০ টাকায় বিক্রি করছে। দৈনিক এতে ২০ কোটি টাকা আয় হচ্ছে। এসবের দালালি আর কমিশনে রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি আমলারা যুক্ত। ঝাড়খণ্ডের অবস্থা আলাদা কিছু নয়। কয়েক মাস মুখ্যমন্ত্রী থেকে মধু কোড়া যদি ৪০০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিতে পারে, তাহলে সহজেই অনুমান করা যায়, কত অর্বুদ-কোটির লুঠ হয়ে চলেছে।

লোহা নয়, আনাজ চাই

ইদানীং ঝাড়খণ্ডে একটা আওয়াজ চালু হয়েছে — 'লোহা নয়, আনাজ চাই; চাষের খেতে সেচ চাই'। সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ্যের ৪৪% বাসিন্দা দারিদ্রসীমার নিচে জীবন কাটাচ্ছে, ৬% মানুষের খাদ্য জোটে না। রাজ্যে ৪৬ লক্ষ টন আনাজের প্রয়োজন, অথচ উৎপাদন হয় মাত্র ২২ লক্ষ টন। ৫২% আনাজের ঘাটতি থেকে আওয়াজ উঠছে — ''লোহা নয়, আনাজ চাই; চাষের খেতে সেচ চাই''। এটা আজ ঝাড়খণ্ডের সাম্প্রতিক প্রতিরোধ আন্দোলনের আওয়াজ হয়ে উঠেছে।

বোকারো জেলার চন্দনকিয়ারি-তে গবাই নদীর ওপর চেক ড্যাম নির্মাণ করে জলসেচ করা হোক — কয়েক বছরের পুরনো এই দাবি আজও অবহেলিত। ইলেক্ট্রো স্টিল ইন্টিগ্রেটেড কোম্পানি ভুলিয়ে ভালিয়ে জমি হাতিয়ে নিয়েছে। স্পঞ্জ আয়রন, ইস্পাত প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হবে। জমির দালালেরা ঝকমকে গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা জমি দিয়েছে, তারা জমি হারিয়ে পস্তাচ্ছে। তারা এখনও জানে না, স্পঞ্জ আয়রন কারখানা কতখানি ক্ষতিকারক। নতুনভাবে প্রতিরোধের ভাবনা চলছে। ধানবাদ, বোকারো আজ এক নতুন দিশার অপেক্ষা করছে।

প্রতিরোধ এবং মাওবাদী

'জান দেব, তবু জমি দেব না; পুঁজিপতিদের এক ইঞ্চি জমিও দেব না' — এই আওয়াজে প্রায় ৩০টি সংগঠন সামনে এসেছে, তারা জন-আন্দোলন সংগঠিত করছে। এদের মধ্যে 'বিস্থাপন বিরোধী একতা মঞ্চ, 'আদিবাসী মূলবাসী অস্তিত্ব রক্ষা সমিতি', 'ঝাড়খণ্ড উলগুলান মঞ্চ', 'ঝাড়খণ্ড মাইন্স এরিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি', 'আজাদি বাঁচাও আন্দোলন', 'বিস্থাপন বিরোধী জনবিকাশ আন্দোলন' ইত্যাদি সংগঠন রয়েছে। স্থানীয়ভাবে 'ভূমি রক্ষা দল' গঠিত হয়েছে। সরকার ও পুঁজিপতিদের প্রায় ৪৫টি স্থানে প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে। ১০২টি চুক্তির মধ্যে ছ-আটটি বাদ দিয়ে কোথাও কাজ শুরু করা যায়নি। যেখানে জমি নিতে সক্ষম হয়েছে, কেবল সেখানেই কাজ শুরু করতে পেরেছে। যদিও সরকার দাবি করছে, ৩০টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

এতদিন রেওয়াজ ছিল, সরকারের নিজে জমি অধিগ্রহণ করে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার। এখন সরকার জমি অধিগ্রহণ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। পুঁজিপতিদের সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে জমি কিনতে হচ্ছে (৭০% পুঁজিপতিদের কিনতে হবে, ৩০% সরকার জোগাবে)। তাই তারা নানারকম ফন্দিফিকির আঁটে, লম্বা-চওড়া প্রতিশ্রুতি দেয় এবং জমির দালাল নিযুক্ত করে। এত করেও ফল পাওয়া যায় না। কৃষকেরা জমি দিতে রাজি নয়। বিশেষত আদিবাসী এলাকায় এটাই দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও জমির চড়া দর হেঁকেও ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। সোনাহাতু-তে এক চমৎকার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। জেএসডব্ল্যু ১০০ জন গ্রামবাসীকে আকৃষ্ট করার জন্য বাঙ্গালোরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ফিরে সেই গ্রামবাসীদের একজন ফনীশ্বর নাথ মুন্ডা বললেন, ''ওখানকার কারখানায় তো আমাদের যোগ্যতার কোন কাজই নেই। কেবল দুজন ওখানে মালির কাজ করে, সেটা আমাদের দ্বারা সম্ভব। বাকি কাজ তো মেশিনে হয়, আমাদের দিয়ে সেটা

হবে না। তাই এখন আর জমি দেওয়ার কোন প্রশ্নই নেই''।

এটাও দেখা যাচ্ছে, যেখানে যেখানে মাথায় হাত বুলিয়ে জমি নেওয়া হয়েছে এবং পরে পুঁজিপতিরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, সেখানে গ্রামবাসীরা আন্দোলন করে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। জামশেদপুরের কাছে কোহিনুর স্টিল প্ল্যান্টে এরকমটাই ঘটেছে। ওখানে ১ অক্টোবর ২০০৮ গ্রামবাসীরা আক্রমণ করে ৭০টি ট্রাক বাজেয়াপ্ত করে নেয়। কোম্পানির কাজও বন্ধ করে দেয় তারা। গ্রামবাসীর অভিযোগ হল, চাষের জমি নিয়ে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক না চাকরি পাওয়া গেছে, না ক্ষতিপূরণ। দূষণ ছড়িয়ে খেতের বারোটা বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এখন কারখানা চালাতে দেওয়া হবে না। একইভাবে জমি সংক্রান্ত নিয়ম না মানায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ খরসাওয়া-তে জুপিটার সিমেন্ট ফ্যাকট্রির কর্মীদের ভাগিয়ে দিয়ে ফ্যাকট্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোহিনূর স্টিল প্ল্যান্ট বিরোধী আন্দোলনের নেতাদের মাওবাদী বলে জেলে পুরে আবার কারখানা চালু হয়েছে।

পূর্ব সিংভূমের পোটকা-তে ভুষণ স্টিল ফ্যাকট্রি কিছু অ-আদিবাসীকে বেশি দামে জমি বিক্রি করতে রাজি করিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আদিবাসীরা জমি দিতে অস্বীকার করেছিল। সরমন্দা নদীর তীরে ভুষণ কোম্পানির তিন কর্মচারী যখন জমি জরিপ করতে এলেন, আদিবাসীরা ওঁদের ধরে আটক করে। ওঁদের মুখে গোবর লেপে দিয়ে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে গ্রামে ঘোরানো হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পোটকা-র রোলাডিহ গ্রামের সোমারি হেমব্রম বলেন, আমরা ঘোষণা করে দিয়েছি যে ভূষণ কোম্পানিকে এক টুকরো জমিও দেব না, তাই আমাদের না জানিয়ে জমি মাপতে এসেছে যারা, তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এরপর ওখানকার ভূমি রক্ষা দলের সংযোজক কুমার চাঁদ মারান্ডিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তা সত্ত্বেও ভুষণ কোম্পানিকে পিছু হটতে হয়, স্টিল ফ্যাকট্রি বানানো যায়নি।

সরাইকেলা খরসাঁওয়ার তন্তোপাসি-তে টাটা কোম্পানিকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সেখানে ২৩টি গ্রাম সাফ করে দিয়ে নতুন স্টিল ফ্যাকট্রি গড়ার কথা ছিল। একইভাবে খুটি ও গুমলা-র ১৬টি গ্রামের ৮৮৫৬ একর জমিতে আর্সেল মিত্তালদের বিশাল এক স্টিল ফ্যাকট্রি বানানোর কথা ছিল। আদিবাসী মূলবাসী অস্তিত্ব রক্ষা সমিতির ঝান্ডার নিচে গত পাঁচবছর যাবৎ লাগাতার আন্দোলন কোম্পানিকে এখনও পর্যন্ত ঢুকতে দেয়নি। ভয়, লোভ সবকিছুকে উপেক্ষা করে পুঁজিপতিদের এক ইঞ্চি জমিও না দেওয়ার গণ আন্দোলনের এটা একটা দৃষ্টান্ত।

সাহেবগঞ্জের মহুলডিহ ও পচুয়াড়া-তে প্যানাম কোম্পানিকে গত ছয়বছর ধরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ৩২টি গ্রামের মানুষ মিলিতভাবে জনতা কার্ফু মোতায়েন করেছে। দুমকা জেলার কাটিকুন্ড ও শিকারিপাড়া-তে সিইএসসি-র বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের ওপর ৬ ডিসেম্বর ২০০৮ গুলি চলে। লখিরাম টুডু ও সঙ্গীতা মারান্ডির মৃত্যু হয় এবং আরও ৭ জন আহত হন। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং মামলার সংখ্যাটা প্রতিদিন বাড়ছে। অভিযুক্তদের সংখ্যা এক হাজার পেরিয়ে গেছে, কিন্তু আন্দোলন থামেনি। কোথাও পুঁজিপতিরা ঢুকতে পারছে না।

হাজারিবাগ ও চাতরা-তে কয়লা খনি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেসব বড়ো কোম্পানি ঢুকছে, তাদের রুখতে 'আজাদি বাঁচাও আন্দোলন' সংগঠনের নেতৃত্বে এক ভিন্ন ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠেছে। গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে জনতা প্রোডিউসার্স কোম্পানি গঠন করা হয়েছে এবং সেখানে দাবি করা হচ্ছে, সমস্ত প্রকল্প এই জনতা প্রোডিউসার্স কোম্পানির হাতে তুলে দিতে হবে; জনতার মালিকানা কায়েম করতে হবে। গোটা ঝাড়খণ্ড বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলিত। আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা, লক্ষ্য একটাই, পুঁজিপতিদের আটকানো ও জল, জঙ্গল, জমি বাঁচানো।

উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দয়ামনি বারলা বলছেন, অতীতে নেতারহাট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ, কোয়েল-কারো প্রকল্প ও ইচা খড়কাই প্রকল্পকে যদি আন্দোলনের শক্তিতে আটকানো সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান আন্দোলনও সফল হবে। ওঁর বক্তব্য হল, ''আইনের ওপর আদিবাসীদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। সুরঙ্গী জলাশয় ও সাহেবগঞ্জে প্যানাম কোম্পানির দ্বারা আদিবাসীদের জমি দখল করার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দাখিল করা আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর সংঘর্ষ ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা নেই''।

এখানে প্রতিরোধের বিভিন্ন রূপ দেখা যাচ্ছে, জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ঐক্য তৈরি হয়েছে, চাকরি-ক্ষতিপূরণ অথবা অন্য প্রতিশ্রুতিকে মানুষ অগ্রাহ্য করছে, যে কোন পরিস্থিতিতে জমি রক্ষা করার এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রয়েছে। সাম্প্রতিক প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি উঠে এসেছে। কেউ কেউ মনে করেন, এটা আদিবাসীদের চেতনার বিকাশ। কেউ একে ওদের হঠকারিতা বলছেন। সরকার একে উন্নয়নের বাধা হিসেবেই মনে করে। এখানে একে স্রেফ মাওবাদী রাজনীতির প্রভাব বলে চিহ্নিত করা সহজ নয়। দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা উচ্ছেদের যন্ত্রণা এবং এখানকার মানুষের প্রতি অন্যায় ও অবিচার এই পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। হয়তো দুটি কারণই থাকতে পারে। এতে সন্দেহ নেই যে এইসব এলাকায় মাওবাদীরা দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় রয়েছে। যখন এরা দুটি আলাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল (এমসিসি ও পার্টি ইউনিটি), তখন থেকেই এদের প্রভাব ছিল। বিভিন্ন সময়ে নানান বিষয়ে এরা জনসাধারণকে সংগঠিত করে এসেছে এবং এদের কার্যকলাপ কখনও কখনও শাসন-প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জও জানিয়েছে। কিছু এলাকায় এখন এদের সশস্ত্র জনসংগঠন গড়ে উঠেছে।

মাওবাদীদের সম্পর্কে বলা হয়, তারা সশস্ত্র পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে উৎখাত করে এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। নিজেদের রণনীতি অনুযায়ী এরা পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা এলাকাকে বেছে নিয়েছে, যেখানে সরকারি মেশিনারি দুর্বল এবং ভয়াবহ দারিদ্র রয়েছে। এদের রাস্তা সঠিক না ভুল, সে নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। এরা সফল হবে কিনা সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে। এরা যে ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়, সেটা কেমন হবে, সেই প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমনই, এরা যেসব এলাকায় সক্রিয় এবং যে শ্রেণীর মানুষের মধ্যে (আদিবাসী) এদের প্রভাব তৈরি হয়েছে, সেসব এলাকা ও সেখানকার মানুষ বর্তমান বিশ্ব অর্থব্যবস্থার সবচেয়ে ক্রুর শিকার। এইসব মানুষেরই জমি হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদেরই সবচেয়ে বেশি ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলি এই বিষয়ে উদাসীন অথবা সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলত, সংসদীয় রাজনীতিতে এইসব মানুষের পক্ষে কেউ নেই। আদিবাসীদের মধ্য থেকে উঠে আসা খানাপিনা করা অংশটিও সরকারি ক্ষমতার অংশীদার হয়ে গেছে। ফলে এই আক্রান্ত আদিবাসীরা সহায়ক শক্তি হিসেবে কেবল মাওবাদীদেরই পাশে পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি মাওবাদী ও আদিবাসীদের মধ্যে কোন বিভাজনরেখার অস্তিত্ব রাখেনি। সরকার সকলকেই একসঙ্গে টার্গেট করে নিয়েছে, সকলকেই উন্নয়নের বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। হতে পারে মাওবাদীদের অ্যাজেন্ডায় এটা কর্পোরেট পুঁজির আগ্রাসন অথবা সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ বিরোধী লড়াইয়ের অঙ্গ। কিন্তু আদিবাসীদের জন্য তা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই কারণেই তারা এই লড়াইয়ে যে কোন পরিস্থিতিতে জীবন দিতেও প্রস্তুত। ভারতীয় সংবিধান তো সমস্ত মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার দেয়। ছোটনাগপুর টেনেন্সি অ্যাক্ট আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীদের কেনাবেচা নিষিদ্ধ করেছে। 'পেসা' (Panchayats Extension to Scheduled

Areas Act, 1996) আইন অনুযায়ী আদিবাসী অঞ্চলের পরিকল্পনায় গ্রামসভার অনুমোদন প্রয়োজন। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রকল্পগুলির জন্য গণশুনানির ছাড়পত্র নিতে বাধ্য করে। এই সমস্তকে অমান্য করে আমাদের সরকার জল–জঙ্গল–জমি এবং খনিজ সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে এবং আদিবাসীদের জীবন–জীবিকা ধ্বংস করছে। এই চিত্রই উঠে আসছে ঝাড়খণ্ডের মাটি থেকে। এর উদাহরণ অন্যত্রও ছড়িয়ে রয়েছে। এর ফলে প্রতিরোধ ছাড়া আর কী পথ থাকতে পারে?

এই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান অভিযানের মাধ্যমে ঝাড়খণ্ডের পাহাড়–জঙ্গল ঘিরে দূরবর্তী এলাকাগুলিকে নিশানা করা হয়েছে। যেখানে কখনও উন্নয়নের এতটুকু আলো পৌঁছায়নি, এখন সেখানে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী কুচকাওয়াজ করছে। অপারেশনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে এমন অঞ্চলগুলিকে, যেখানে পুঁজিপতিরা শিল্প গড়তে চায়, কিন্তু স্থানীয় মানুষের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন, বুন্ডু, তমার, খরসাওয়া, চান্ডিল, সোনাহাতু ইত্যাদি অঞ্চল। এছাড়া, নেতারহাটের মহুয়াটাড় ইত্যাদি অঞ্চল, যেখানে বক্সাইট খনি আছে ও সারান্ডা, কিরিবুরু অঞ্চল, যেখানে লোহার খনি আছে, এগুলি অপারেশনের বর্তমান নিশানা। এই অঞ্চলগুলিতে ঝাড়খণ্ডের একটি তথ্য অনুসন্ধানকারী দল জানতে পারে, খরসাওয়া ব্লকের রাজিয়ামা গ্রামে ২১ মার্চ মোটকি মুন্ডাইন ও সামুনি মুন্ডাইনের ওপর যৌন অত্যাচার চালায় এবং গ্রামের লোকেদের বেধড়ক মারধোর করে সন্ত্রস্ত করে দেয়। এই দলটি আরও জানতে পারে, এই অঞ্চলগুলিতে সিআরপি নিয়মিত ঢুকে গ্রামের লোকেদের মারধোর করছে এবং কাউকে কাউকে গ্রেপ্তারও করছে। মাঝেমাঝেই গ্রামের লোকেদের সিআরপি ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গিয়ে চার–পাঁচদিন রেখে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় এবং পুলিশের গুপ্তচর হওয়ার জন্য চাপ দেয়। ইস্কুল এবং হাসপাতালগুলি সিআরপি ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামগুলি খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিরুনি তল্লাশির ফলে আদিবাসীদের জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। জঙ্গল থেকে মহুয়া, চিরোঞ্জি, জ্বালানি–কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করাও নিষেধ। এমনকী আটা, ডাল, চাল ইত্যাদি কিনতে গেলেও জবাব দিতে হচ্ছে, কেন কার জন্য কেনা হচ্ছে। ঘরে ঘরে ভোটার কার্ড পরীক্ষা করে গ্রামের উপস্থিত ও অনুপস্থিতদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। যাদের পরিচয়পত্র নেই, তাদেরও চিহ্নিত করে রাখা হচ্ছে আলাদাভাবে। পুরো জনজীবন সশস্ত্র বাহিনীর ঘেরাটোপে বন্দী। কেউ সামান্য বিরোধিতা করলেই সঙ্গে সঙ্গে ওদের হাতে আটক হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও কেন্দ্রীয় অভিযানের ওপর প্রশ্নচিহ্ন জারি রয়েছে। ফৌজি কার্যকলাপের মাধ্যমে কি প্রতিরোধের মুখে লাগাম দেওয়া যাবে? উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনকারী দয়ামণি বারলা, শম্ভু মাহাতো, কুমারচাঁদ মান্ডি, দামোদর তুরি–দের মত হল, সন্ত্রাস চালিয়ে আদিবাসীদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া এবং আদিবাসীদের জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য করাই 'গ্রিন হান্ট'–এর উদ্দেশ্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম বলেছেন, যে বুদ্ধিজীবী ও এনজিও–রা এই অপারেশনের বিরোধিতা করছে, তাদের ওপরও 'আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট' প্রয়োগ করা হবে। তা সত্ত্বেও ঝাড়খণ্ডের প্রতিরোধ আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মধ্যেও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। দিগ্বিজয় সিং এই অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জনসমক্ষে আলোচনা তুলে দিয়েছেন। কুর্শি বাঁচানোর জন্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তটস্থ হয়ে রয়েছেন। বলা হচ্ছে, পরিষেবা ও উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিদ্রোহের মোকাবিলা করা হবে। পুঁজিপতিদের লুঠকে আড়াল করতে এইসব স্তোকবাক্য কতটা কার্যকর হবে, তা বলা যাচ্ছে না। কেউ এটা বলছে না, পুঁজিপতিদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি বাতিল করা হোক; বন্ধ হোক এই লুন্ঠন; বন্ধ হোক আদিবাসীদের বিতাড়ন। ফলে দমন ও প্রতিরোধের টানাপোড়েন জারি রয়েছে।

টীকা ও সূত্র :

১) ওয়ার অন আদিবাসী : আপডেট।

২) আদিবাসী মাইনিং অ্যান্ড মনোপলি ক্যাপিট্যাল : আপডেট।

৩) ঝাড়খণ্ড সরকারের তথ্য দপ্তর।

৪) ইমপ্যাক্ট অব মাইনিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইন ঝাড়খণ্ড, নীতিশ প্রিয়দর্শী, আমেরিকান ক্রনিকল, ২৮ অক্টোবর ২০০৮।

৫) বিকাশ ও বিস্থাপন, পার্সপেক্টিভ।

৬) গ্লাডসন ডুঙডুঙের সাথে বাক্যালাপ।

৭) ফিলহাল, ১৫–১৮, ২৩–২৪ সংখ্যা, ২০০৯।

---

২ পৃষ্ঠার শেষাংশ ... দয়ামণি বারলার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

দিশায় এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে?

দ.বা.: ২০০৪–০৫ সালে আমি খবরের কাগজে দেখলাম, গুমলা ও খুঁটির কাছে আর্সেলর মিত্তালরা ওদের প্ল্যান্ট বানাবে। আমি সরকারি আধিকারিকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আর্সেলর মিত্তাল যে প্ল্যান্ট বানাবে তার জমি কোথা থেকে পাবে? আধিকারিকরা জানাল, ১২০০০ একর জমি এক লপ্তে সরকারের কাছে নেই। তাই কৃষক ও আদিবাসীদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হবে। প্রথমদিকে অ–আদিবাসীরা জমি দিতে রাজি ছিল। আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে লোকেদের বোঝাই, জমিগুলো দিয়ে দিলে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার কী পরিণতি হয়। তখন গ্রামের লোকেরা বুঝল এবং একজোট হল। লোকেরা বুঝতে পারল, আর্সেলর মিত্তাল প্ল্যান্ট বানালে আমরা পুরোপুরি বরবাদ হয়ে যাব। এরপরে যারা জমি দিতে ইচ্ছুক, তাদের মিত্তালরা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে শুরু করল। আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করার পর ২০০৭–০৮ থেকে মিত্তাল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, জমি না পেলে আমরা চলে যাব। মিত্তালের সমর্থকেরাও — যারা জমি দিতে ইচ্ছুক — এই চাপ তৈরি করতে থাকল। কিন্তু ব্যাপক মানুষ এখনও জমি দিতে রাজি নয়। প্ল্যান্ট বানানো স্থগিত হয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন : আপনাদের পরিচয় সম্পর্কে বলুন।

দ.বা.: সব মানুষেরই পরিচয় থাকে তাদের ধর্মস্থানের মধ্যে, তাদের ইতিহাসের মধ্যে। এটা মুখে বললে বোঝা যাবে না। এটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে, কারোর ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলে তারা কতখানি আহত হয়। তার জন্য লোকে জীবন দিয়ে দেয়।

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হোন।

একবছরের ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক–চাঁদা পঞ্চাশ টাকা।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com.

পশ্চিমবঙ্গের ফলতায় শ্রমিক শোষণ : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা

ব্যাসদেব দাশগুপ্ত

পূর্ব ভারতের মুক্ত শিল্পশ্রমিকের (footloose industrial labour[১]) এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতায়। আমরা যে তিনটি স্পেশাল ইকনমিক জোন (SEZ) নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছিলাম, তার একটা ছিল ফলতায়। শ্রম-পরিবেশের ভয়াবহ দুর্দশা, কাজের অনিশ্চয়তা এবং চূড়ান্ত শ্রমিক শোষণের দৃষ্টান্ত এই ফলতা; শিল্পায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বাণিজ্যমুখী উন্নয়নের এক ব্যর্থতার প্রতীক এখানকার এসইজেড, যা শিল্পপতিদের শিল্প থেকে হতাশায় মুখ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে।

হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত ফলতা মূলত একটি গ্রামাঞ্চল।[২] চাষ এবং আনুষঙ্গিক নানান কাজ নিয়ে এখানকার অর্থনৈতিক জীবন। কলকাতা থেকে আনুমানিক ১০০ কিমি দূরে এই অঞ্চলটি ঘিরে রয়েছে কিছু বড়ো বড়ো শিল্প। ফলতার বাসিন্দারা মূলত কৃষিজীবী। ১৯৮৬ সালে ফলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন তৈরি হয়; পরে সেটাই সরকারি নীতি অনুযায়ী রূপান্তরিত হয় স্পেশাল ইকনমিক জোনে।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ফলতার জনসংখ্যা ২,২১,৬৯৫। প্রতি বছর এই জনসংখ্যা ১১.৬৯% হারে বেড়েছে; এটা এই জেলার গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির (১৭.৪৬%) হারের নিচে। এই জেলার জনঘনত্ব প্রতি কিমিতে ১৬৯৬, গ্রামীণ এলাকায় সংখ্যাটা ১৭৪৭। ১৯৯১ সালে এখানে নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল ৯২৮ : ১০০০; ২০০১ সালে মেয়েদের উপস্থিতি সামান্য বেড়ে তা দাঁড়ায় ৯৪১ : ১০০০।

সারণী ১ : ফলতায় শ্রমিক ও অ-শ্রমিক জনসংখ্যার বিন্যাস

	১৯৯১			২০০১		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
মূল ও প্রান্তিক শ্রমিক	৬১২৬০ (৩০.৬৮)	৫৪২৩৩ (৫২.৬৭)	৭০২৭ (৭.৩৬)	৭৩০৪৭ (৩২.৯৬)	৬২৪৬৩ (৫৪.৬৮)	১০৫৮৪ (৯.৮৫)
মূল শ্রমিক	৫৬৩৯৪ (২৮.৪১)	৫২৬৩১ (৫১.১২)	৩৭৬৩ (৩.৯৪)	৫২৪০৯ (২৩.৬৪)	৪৮২৫৫ (৪২.২৪)	৪১৫৪ (৩.৮৭)
প্রান্তিক শ্রমিক	৪৮৬৬ (২.৪৫)	১৬০২ (১.৫৬)	৩২৬৪ (৩.৪২)	২০৬৩৮ (৯.৩১)	১৪২০৮ (১২.৪৪)	৬৪৩০ (৫.৯৮)
চাষি	১০২৯৬ (১৬.৮১)	৯৭০৩ (১৭.৮৯)	৫৯৩ (৮.৪৪)	৭৭৫৯ (১০.৬২)	৬৯৩২ (১১.১০)	৮২৭ (৭.৮১)
খেতমজুর	১৬০১৯ (২৬.১৫)	১৫১৮৬ (২৮.০০)	৮৩৩ (১১.৮৫)	২২৭৬৩ (৩১.১৬)	১৯০৬১ (৩০.৫২)	৩৭০২ (৩৪.৯৮)
ঘরোয়া শিল্প শ্রমিক	২৮৫৩ (৪.৬৬)	২০৮৪ (৩.৮৪)	৭৬৯ (১০.৯৪)	৬৩৯৭ (৮.৭৬)	৩৯১৯ (৬.২৭)	২৪.৭৮ (২৩.৪১)
অ-শ্রমিক	১৩৭২৩১ (৬৯.১৪)	৪৮৭২৭ (৪৭.৩৩)	৮৮৫০৪ (৯২.৬৪)	১৪৮৬৮৪ (৬৭.০৫)	৫১৭৬৯ (৪৫.৩২)	৯৬৮৭৯ (৯০.১৫)
অন্যান্য শ্রমিক	২৭২২৬ (৪৪.৪৪)	২৫৬৫৮ (৪৭.৩১)	১৫৬৮ (২২.৩১)	৩৬১২৮ (৪৯.৪৬)	৩২৫৫১ (৫২.১১)	৩৫৭৭ (৩৩.৮০)

নোট : বন্ধনীর মধ্যে পরিসংখ্যানগুলি হল বিশেষ বিভাগে এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার শতকরা হিসাব। সূত্র : সেনসাস অফ ইন্ডিয়া, ভারত সরকার, ২০০১।

জনগণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ফলতার শ্রমশক্তির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সারণী ১-এ। এতে চাষি ও খেতমজুরদের যুক্ত করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয়, মোট মূল ও প্রান্তিক শ্রমিকদের ৪২%-এর মতো প্রত্যক্ষ চাষি অথবা কৃষি-শ্রমিক হিসেবে কৃষিতে যুক্ত ছিল। অর্থাৎ মোট শ্রমজীবীদের বাকি ৫৮% ম্যানুফ্যাকচারিং এবং অন্যান্য পরিষেবায় যুক্ত ছিল। বিগত দশকে এই অঞ্চলে বাণিজ্য ও পরিবহণের মতো কিছু স্থানীয় পরিষেবার বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। যেখানে মূল ও প্রান্তিক শ্রমিকদের মিলিত সংখ্যা চরম ও আপেক্ষিক দুই বিচারেই বেড়েছে, সেখানে ১৯৯১ সাল থেকে মূল শ্রমিকদের সংখ্যা এবং শতাংশ দুই-ই কমতে দেখা গেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে যুক্ত শ্রমিকেরা এই মূল শ্রমিক বিভাগের অন্তর্গত। ২০০১ জনগণনায় উল্লেখিত ১৯৯১-২০০১ পর্যায়ে মূল শ্রমিকদের সংখ্যার এই তাৎপর্যপূর্ণ হ্রাস একভাবে সেই শিল্পগত কার্যকলাপের হ্রাসকেই চিহ্নিত করছে যার অনেকটাই ফলতা এসইজেডে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। আমাদের সমীক্ষা চলাকালীন এক বি-শিল্পায়নের প্রক্রিয়া ছিল আসন্ন, যখন কারখানার কাজে আগ্রহ হারিয়ে শ্রমিকেরা চাষের কাজে অথবা সরকারি দারিদ্র দূরীকরণ/গ্রামীণ রোজগার প্রকল্পের কিছু নিম্নতর মর্যাদার কাজের দিকে ঝুঁকছিল। লিউইস টাইপের উন্নয়ন মডেলে শ্রমিক নিয়োগের যে দাবি করা হয়ে থাকে, তা নাকচ হয়ে যাচ্ছে এখানকার এই প্রক্রিয়ায়, যেখানে শিল্প থেকে কৃষিতে এক বিপরীতমুখী যাত্রা দেখা যাচ্ছে। বাস্তবত, এই ধরনের বিপরীত অভিবাসন তথাকথিত দ্বৈত অর্থনৈতিক কাঠামোর সমস্ত উন্নয়নের মডেলেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে।[৩]

সারণী ১ থেকে দেখা যাচ্ছে, 'অন্যান্য শ্রমিক' বিভাগে ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে মূল ও প্রান্তিক শ্রমিকের মোট সংখ্যার অনুপাতে একটা লক্ষণীয় উল্লম্ফন ঘটেছে। জনগণনার রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে, এরা মূল চাষের অথবা শিল্পের কাজ কোনটাতেই যুক্ত ছিল না। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, গ্রামীণ রোজগার প্রকল্পের (যেমন, গ্রামের রাস্তা নির্মাণ) নিম্নতর মর্যাদার কিংবা অস্থায়ী কাজে অথবা মাঠে (মরসুমী চাষের কাজে), এমনকী ইটভাটায় দিনমজুরির কাজেও স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ বেড়েছে। এই অঞ্চলে এই ধরনের অসংগঠিত (ইনফর্মাল) কাজের তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটেছে, যেখানে মজুরি তুলনায় কম (২০-২৫ টাকা রোজ, অন্য কোন সুবিধা নেই) এবং কাজের পরিবেশ এমনই যা শ্রমিকদের মধ্যে পেশাগত রোগের জন্ম দেয়।

---

[১] জান ব্রেমান তাঁর বই ***Footloose labour: Working in India's informal economy*** **(Cambridge University Press, 1996)**-এ ***footloose labour*** এই শব্দচয়ন করেছিলেন।

[২] ভারতের জনগণনা পরিসংখ্যান অনুযায়ী ফলতার ভৌগোলিক আয়তন ১৩০.৬৮ বর্গ কিমি, এটি গ্রামাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত এবং জেলার মোট গ্রামীণ এলাকার ১.৩৪%।

[৩] লিউইস এবং পরে হ্যারিস-টোডারো এবং রানিস-ফেই কাঠামোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় 'আধুনিক' শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়ন, যা শ্রমকে 'পশ্চাদপদ' কৃষি অথবা প্রাথমিক কার্যকলাপ থেকে সরিয়ে নেয় এবং এই রূপান্তর স্থায়ী, কেননা 'আধুনিক' ক্ষেত্রের উন্নয়নকে এক অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া মনে করা হয়। এখানে আমাদের ফলতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটি বিপরীত দাবিই তুলে ধরা যেতে পারে।

ফলতা এসইজেড

প্রায় ২০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে ফলতার এসইজেড, বিদেশের বাজারের জন্য এখানে কমবেশি ৩০০টি শিল্প-ইউনিট চালানোর মতো জায়গা রয়েছে। ফলতা এসইজেডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী এখানে রয়েছে ৯০টি চালু ইউনিট। আমাদের সমীক্ষার সময় আমরা কেবল ৩০-৩৫টি চালু ইউনিট দেখতে পেয়েছি। প্রথমে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা একটি পরীক্ষামূলক (পাইলট) সমীক্ষা চালাই। এর পরে ২০০৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে আমরা দ্বিতীয় দফায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করি। আমরা ৪৪ জন কারখানা-শ্রমিকের সাক্ষাৎকার নিই; এছাড়া জোনের লোডিং-আনলোডিং শ্রমিকদের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছিলাম। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ ছিল এইরকম :

ফ্যাকট্রি এবং তার কর্তৃপক্ষ

আমাদের সমীক্ষার সময় জোনে সামান্য ক'টি (প্রায় ৩০-৩৫টি) শিল্প-ইউনিট চালু ছিল। জোনের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলি হল প্লাস্টিক এবং টেক্সটাইল, সামান্য কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটও রয়েছে। শিল্পগুলি বেশিরভাগই শ্রম-নিবিড়। এক বিপুল সস্তা শ্রমের উপস্থিতির জন্যই মনে হয় এই জোনটি গড়ে উঠেছে, বন্দরের নিকটবর্তী হওয়ার ভৌগোলিক সুবিধার দিকটিও পাশাপাশি রয়েছে।

ফলতা এসইজেডের চারপাশের এলাকার মধ্যে কাশীপুর অন্যতম প্রধান একটি গ্রাম। জোনের এক কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যেই এর অবস্থান। এখানে বিদ্যুৎ নেই; দুটি টিউবওয়েলের মাধ্যমে প্রায় ১০০ পরিবারের ঘরে জলের বন্দোবস্ত হয়। একদিন সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে বসে আমরা একটা চায়ের দোকানে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে গল্পগুজব করছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ কথাবার্তা বলা গেল না। সেখানে এক স্থানীয় মানুষ — সম্ভবত কোন রাজনৈতিক ক্ষমতাবান কেউকেটা — উপস্থিত হয়ে প্রাচীন গ্রাম্য মোড়লের মতো বিশ্রি ব্যবহার করতে শুরু করলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের ফ্যাকট্রির কাজ এবং তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সংক্রান্ত কথাবার্তা পছন্দ করছিলেন না। অতএব আড্ডাটা মাঝপথেই শিকেয় উঠল।

ফলতা মূলত একটি গ্রামাঞ্চল। লোকে এখানে সাধারণত চাষের কাজটা পছন্দ করে। সেই সঙ্গে তারা ফ্যাকট্রির কাজ নয় এমন দিনমজুরিও করতে চায়। কেননা তাদের কাছে ফ্যাকট্রির কাজ মজুরি ও কাজের ঘন্টার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে কম আকর্ষণীয়। কাশীপুর গ্রামে বহু মানুষ ফ্যাকট্রির কাজ ছেড়ে দিয়ে চাষের কাজ বা অন্য নিম্নতর মর্যাদার কাজ — মূলত ইটভাটায় — ফিরে গেছে। বেশিরভাগ শ্রমিককে দিনে ১২ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় কাজ করতে হয়; আয় হয় গড়ে দৈনিক মাত্র ৩০-৪০ টাকা। মেয়েরা পায় আরও কম, গড়ে ২০-৩০ টাকা।

শ্রমিকেরা

কাজের ধরনটা এমনই যে খুব কম শ্রমিককেই ইউনিটগুলিতে ফ্যাকট্রির খাতাপত্রে প্রকৃত শ্রমিক হিসেবে দেখানো হয়। যেমন, একটি জুতো কারখানায় প্রায় ৬০০ শ্রমিক রয়েছে, কিন্তু ফ্যাকট্রি রেজিস্ট্রারে মাত্র ৩০ জনের নাম রয়েছে। যাদের নাম ফ্যাকট্রি-বুকে নেই, কোন অবস্থাতেই তারা সেই বিশেষ ফ্যাকট্রির শ্রমিকের মর্যাদা দাবি করতে পারে না। এতে লাভবান হয় ফ্যাকট্রির মালিক।

এইসব ইউনিটে স্থায়ী শ্রমিক যৎসামান্য। অতএব স্থায়ী এবং অস্থায়ী শ্রমিকের ফারাকের বালাই নেই। মজুরি বেশ কম, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা সর্বনিম্ন মজুরির হারের তুলনায় কম। অদক্ষ শ্রমিকের গড় মজুরি দৈনিক ৩০-৪০ টাকা, এর কম পায় এমন শ্রমিকও রয়েছে। নো-ওয়ার্ক-নো-পে ভিত্তিতে মজুরি দেওয়া হয় — এমনকী স্থায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও। কাছাকাছি গ্রামগুলি থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়। এসইজেডের চারপাশের এলাকা এখনও বেশ অনুন্নত, রাস্তাঘাটের যোগাযোগও তেমন নেই। জোনের দু'কিমির মধ্যেকার কিছু গ্রামে — কাশীপুরের কথা আগেই বলেছি — বিদ্যুৎ নেই। শ্রমিকেরা মূলত ঠিকেদারদের মাধ্যমে কাজে আসে। এই ঠিকেদাররা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের প্রভাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। শ্রমিকদের পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ইউনিয়নগুলি একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে। শিল্প-ইউনিটগুলি এদের ওপর নির্ভর করে চলে এবং সেই অনুযায়ী তারা ঠিকেদারদের শ্রমিক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সময় দেওয়ার ব্যাপারে শ্রমিকেরা ভয় পাচ্ছিল, কেননা ঠিকেদার এবং স্থানীয় ইউনিয়ন নেতাদের ভয়ে তারা ভয়ানক আতঙ্কিত ছিল।

শ্রমিকদের ওপর নজরদারি এবং আধিপত্যের শৃঙ্খলটা এরকম : শ্রমিক→ইউনিয়ন এবং/অথবা ঠিকেদার→মালিক। শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সুপারভাইজার পদে রয়েছে। যদিও কাজের দিক থেকে সুপারভাইজর এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় কোন তফাত নেই। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে সুপারভাইজার ঠিকেদার/ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ লোকও হতে পারে। আমরা একটি ঘটনায় দেখতে পাই, একটি প্লাস্টিক ইউনিটে সুপারভাইজার পদে থাকা একজন মহিলার (তিনি এক ঠিকেদারের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছেন) ইএসআই কার্ড কোম্পানি পুনর্নবীকরণ করেনি এবং তিনি তা নিয়ে ইউনিয়নের কাছে অভিযোগ করেছেন। তিনি নিজে সেই ইউনিয়নের সদস্য। এই খবরটা তাঁর ঠিকেদারের কাছে চলে যায়। তাঁকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়, যদিও তাঁর মাইনে চালু রাখা হয়। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে এরপর তাঁর কাজটা বরাবরের মতো চলে যাবে; তিনি জোনের অন্য কোন ইউনিটেও আর কাজ পাবেন না। কারণ জোনের ইউনিয়ন এবং ঠিকেদারদের মধ্যে জোরদার যোগাযোগ রয়েছে।

সাধারণত জোনে কোম্পানিগুলি ঠিকেদারদের পাওনা মেটায়, ঠিকেদাররা নিজেদের অংশ কেটে নিয়ে শ্রমিকদের পেমেন্ট করে। শ্রমিকেরা জানে না কতটা অংশ ঠিকেদাররা রেখে দেয়। এবার ইউনিয়নের ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা প্রয়োজন মতো সরাসরি ইউনিয়নকে টাকা দেয়। এখানে সদস্য চাঁদার ব্যবস্থাও রয়েছে, সেই টাকাটা কিস্তিতে দেওয়া যেতে পারে। যে শ্রমিকেরা ইউনিয়নভুক্ত নয়, তারা সাধারণত ইউনিয়ন অফিসে আসতে চায় না, কারণ তারা ইউনিয়ন নেতাদের এড়িয়ে চলতে চায়। শ্রমিকদের ওপর ঠিকেদারদের নিয়ন্ত্রণ সমস্ত অর্থেই সর্বাত্মক। এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ইউনিয়ন নেতা, ঠিকেদার এবং স্থানীয় শাসক পার্টির নেতাদের একটা সম্পর্কের বন্ধন।

স্থায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অনেকেই প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পিএফ-এর সুবিধা পায় না। যদিও সাম্প্রতিক আইনের সংশোধন অনুযায়ী পিএফ দেওয়া বাধ্যতামূলক। আমরা এমন একটা দৃষ্টান্তও পাইনি, যেখানে শ্রমিকদের গ্রাচুইটি দেওয়া হয়েছে। সাধারণত এখানে অবসরের বয়স বলে কিছু নেই। স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য ছুটির নিয়ম রয়েছে — অসুস্থতাজনিত ছুটি সমেত বছরে ১৫ দিন। মহিলাদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির কোন অস্তিত্ব এখানে নেই। ঠিকেদারদের মাধ্যমে নিযুক্ত শ্রমিকদের ছুটির কোন ব্যবস্থা নেই।

কিছু দক্ষ শ্রমিক — মূলত টেকনিকাল হ্যান্ড এবং আইটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত — বাইরের এলাকা থেকে আসে। মাইনে এবং সুবিধার (থাকার বন্দোবস্ত সহ) বিচারে এদের অবস্থা সামান্য ভালো। জোনে স্থানীয়দের অভিবাসনের ঘটনা খুব কম। যথেষ্ট দক্ষতার অভাবে এখান থেকে অন্যত্র অভিবাসনের ঘটনাও কম। আমরা একটা ঘটনা পেয়েছিলাম, জোন তৈরির পর একজন গুজরাত থেকে তাঁর ফলতার বাড়িতে ফিরে

এসেছিলেন। কিন্তু ফলতায় ৫–৬ বছর কাজ করার পর তিনি আফশোষ করছিলেন যে, এখানকার অবস্থাটা ওখানকার চেয়েও খারাপ।

একটা জিনিস এখানে দেখা গেছে, দারিদ্র সত্ত্বেও প্রত্যেক ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। স্কুলের ছাত্র, যারা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করছে (ধরা যাক, ক্লাস এইট পর্যন্ত), তাদের সংখ্যা ভালো তো বটেই, সম্ভবত বাড়ছে। এতে হয়ত মিড-ডে মিলের অবদান রয়েছে। এই অঞ্চলে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, একটা মাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র এবং একটা হাসপাতাল রয়েছে কাছাকাছি মহকুমা শহরে।

ফলতা এসইজেড এবং তার আশপাশে মানুষের জন্য ব্যাঙ্কের কোন সুবিধা নেই। সঞ্চয় করার মতো অবস্থায়ও তারা নেই। বরং প্রয়োজনে স্থানীয় সুদখোর এবং আত্মীয়/বন্ধুদের কাছ থেকে তারা টাকা ধার করে। ধার নেওয়ার প্রধান কারণগুলি হল : বিবাহ, অসুস্থতা এবং ঘরবাড়ি মেরামত করা। আমরা এটাও দেখেছিলাম, লোকে সুযোগ পেলেই আমাদের সঙ্গে তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে কথা বলতে চাইছিল; বিশেষত যখন তারা ইউনিয়ন অফিস থেকে এবং/অথবা ঠিকেদারদের থেকে দূরে থাকছিল — এদের তারা বিশ্বাস করে না এবং ভয় পায়।

ফ্যাকট্রির খাতায় তালিকাভুক্ত সমস্ত ক্যাজুয়াল ও ঠিকা শ্রমিক যে কাজ পাবেই, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রতিদিন সকালবেলা তারা এসইজেডে ফ্যাকট্রির গেটগুলিতে জড়ো হয়, এর জন্য অনেককে এক ঘন্টা বা তারও বেশি সময় পায়ে হেঁটে আসতে হয়, কারণ তাদের একটা সাইকেলও নেই।

পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। বহু ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যেরা ফ্যাকট্রির কাজ নেয় না এবং অগতির গতি হিসেবে মহিলারা সেই কাজ নেয়। কারণ পরিবারের পুরুষ সদস্যেরা বহু ক্ষেত্রেই ফ্যাকট্রির কাজের চেয়ে মাঠে চাষের কাজ অথবা সরকারি প্রকল্পে মাটি খোঁড়ার কাজ পছন্দ করে।

শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে আমরা যখন ফ্যাকট্রির গেটে তাদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করেছি, তখন তারা অনেক খোলামেলা কথাবার্তা বলেছে। এই কারণে সমস্ত অংশের শ্রমিকদের সঙ্গে সমানভাবে কথা বলতে পারায় আমাদের সমীক্ষা সম্ভবত অপক্ষপাতদুষ্ট হতে পেরেছে। এছাড়া, শ্রমিকদের সঙ্গে ইউনিয়নের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আমাদের সমীক্ষা আপেক্ষিকভাবে অপক্ষপাতদুষ্ট থেকেছে। কারণ সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন নেতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁদের উপস্থিতিতে আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি। নেতাদের উপস্থিতিতে শ্রমিকেরা অনেক কথাই বলতে পারেনি। আবার ফ্যাকট্রি গেটের বাইরে রাস্তায় শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এটা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

যুদ্ধের রূপান্তর

শমীক সরকার

যুদ্ধ শব্দটার একটা সামাজিক মানে আছে, অন্তত আমাদের চেনা পরিচিত গ্রাম-সমাজের কাছে। চেনা জনপদের সীমানায় হয় যুদ্ধ, শত্রু আক্রমণ করে বাইরে থেকে। সেই আক্রমণ ঠেকাতে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হাজির হয় সমাজের জোয়ানরা। কেউ লাঠি-সোটা নিয়ে, কেউ বল্লম নিয়ে, কেউ তীর-ধনুক নিয়ে, কেউ পেটো-বোমা নিয়ে, কেউ বা আবার ছোটোখাটো বন্দুক নিয়ে। আমার ছোটোবেলায়, মানে আজ থেকে বছর ২৫ আগে নদীয়া জেলায় আমাদের গ্রামের থেকে জোয়ানরা তীর ধনুক আর বল্লম নিয়ে গিয়েছিল পাশের গ্রামের লোকেদের সাথে যুদ্ধে। কল্যানী শিল্পাঞ্চলের এক কারখানায় কয়েকশ' লোকের চাকরির বন্দোবস্ত হচ্ছিল। স্থানীয় লোক চাকরি পাবে। কারা চাকরি পাবে, তাই নিয়ে বেধেছিল লড়াই, দুই গ্রামের মধ্যে। আজ থেকে ১৪ বছর আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের কাছে বেশ কতগুলো গ্রামে যুদ্ধ বেধেছিল তীর-ধনুক, টাঙি নিয়ে। বন্দুকও ছিল। আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডী দলগুলোর আধিপত্যের গ্রামগুলির সঙ্গে সিপিএম অধ্যুষিত গ্রামগুলির। নন্দীগ্রামের জনপ্রতিরোধ এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলী এক যুদ্ধ হিসেবে চাউর হয়েছিল নন্দীগ্রামের স্থানীয় মানুষের কাছে। তালপাটি খালের সীমানায় খেজুরির সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছে নন্দীগ্রাম। প্রতিটি জনপদেরই হয়ত এই নিজস্ব যুদ্ধের ইতিহাস আছে কমবেশি। এবং তা খুব পুরনো নয়। আজকের রাজনৈতিক সংঘর্ষের আর গ্রাম দখলের পশ্চিমবঙ্গে এটা ঘোরতর বাস্তব। রোজই লোক মরছে, বাড়ি পুড়ছে...।

যুদ্ধ শব্দের একটি ছোটো জনপদের সমাজের কাছে যা ব্যঞ্জনা, তার থেকে অনেকটাই আলাদা আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে যুদ্ধের মানে। তাই জনপদের লোক এগুলোকে যুদ্ধ বললেও, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এগুলোকে বলি সংঘর্ষ। খবরের কাগজেও তাই লেখা হয়।

রাষ্ট্রীয় স্তরে যুদ্ধ একটি স্থিতিশীল বাস্তবতা। তাই যুদ্ধের জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত রাখতে হয় প্রশিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নির্দিষ্ট বাহিনী। লাখ লাখ লোকের সেই বাহিনীর ভরণপোষণ করে সরকার, কেবল যুদ্ধের জন্য। প্রত্যেক বছর পুরনো মরচে ধরা অস্ত্রগুলো বাদ দিয়ে নয়া কিসিমের অস্ত্র কেনা হয়। পৃথিবীতে এমন কোনও রাষ্ট্র নেই, যার নির্দিষ্ট সেনাবাহিনী নেই। রাষ্ট্রীয় স্তরে যুদ্ধ যে একটি স্থিতিশীল বাস্তবতা, তা আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল, যখন রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার মিত্র সবাইকে ডেকেডুকে 'নাৎসী বিজয়' উৎসব করল মস্কোতে। বাছা বাছা সব অত্যাধুনিক গণ বিধ্বংসী অস্ত্রের সম্ভার সাজিয়ে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেদভেদেব ঘোষণা করলেন, শান্তি খুব পলকা জিনিস, যুদ্ধ তো আর হঠাৎ করে আসে না, সম্ভবনা হিসেবে থেকেই যায়, তাই তৎপর থাকতে হবে নিত্যনতুন বিপদগুলো থেকে।

যুদ্ধের রূপান্তর : সমরাঙ্গন থেকে জনপদে

১৮৭০ সাল থেকেই ইউরোপে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধগুলিতে দুইয়ের বেশি রাষ্ট্রের যোগদানের সম্ভাবনা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। দেখা যাচ্ছিল, এই দেশে আক্রান্ত হলে ওই দেশ আক্রমণকারীকে আক্রমণ করবে, অথবা এই দেশ কাউকে আক্রমণ করলে ওই দেশ চুপচাপ দেখবে — এই জাতীয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। এরই সর্ববৃহৎ প্রকাশ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মূলত ইউরোপব্যাপী দেশগুলো জড়িয়ে পড়েছিল যুদ্ধে, কখনও কখনও তাদের উপনিবেশগুলিও জড়িয়ে গিয়েছিল। দেশগুলি যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, তার সবচেয়ে বড়ো কারণ হিসেবে ছিল বাজার দখলের লড়াই, উপনিবেশের কাঁচামালের ওপর কব্জা প্রতিষ্ঠা। বাজার দখল এবং কাঁচামালের তাগিদ রাষ্ট্রগুলির গন্ডি ছাপিয়ে অনেকগুলি রাষ্ট্রকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে নিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের যে চিরাচরিত ভূ-সীমানা দখলের তাগিদ এবং তজ্জনিত দ্বৈত ভূমিকা, তাকে ছাড়িয়ে অন্য এক তাগিদ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের কারণ হিসেবে সামনে চলে এল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ২০ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় একটি বিশ্বযুদ্ধ চলে এল। এও এক রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। এ যুদ্ধ আগেরটির চেয়েও অনেক সর্বব্যাপী। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক একটি যুদ্ধের বাতাবরণ নিয়ে এল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৯২৯ সাল থেকে যে মন্দায় জড়িয়ে পড়েছিল, তার অবসান ঘটেছিল এই যুদ্ধের মাধ্যমে। মার্কিন কর্পোরেটরা অস্ত্রের বড়ো বড়ো নতুন কারখানা বানিয়ে অস্ত্র উৎপাদন শুরু করে দিল। ১৯৪৪ সালের মধ্যে দেখা

গেল, এই যুদ্ধে বিবদমান সমস্ত গোষ্ঠীর তুলনায় সবচেয়ে বেশি অস্ত্র বানিয়েছে এই দেশ। যুদ্ধের প্রয়োজনে সবাই মিলে মোট যে অস্ত্র বানিয়েছিল, তার ৪০ শতাংশ বানিয়েছিল আমেরিকা। অথচ গোটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এই দেশটি ছিল অনেক দূরে। যুদ্ধে অবতীর্ন দেশগুলির মধ্যে আমেরিকার মাটিই ছিল সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্থ।

মিত্রশক্তির ব্রিটিশ বায়ু মন্ত্রকের তরফে দেশের বোমারু কমান্ডের কাছে নির্দেশ গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, "তোমাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হবে শত্রুর নাগরিক জনসংখ্যা (enemy civil population) এবং বিশেষত শিল্প শ্রমিকদের মনোবল ভেঙে দেওয়া।" শহরাঞ্চলে বোমা মারতে হবে, কিন্তু "লক্ষ্যবস্তু হবে সাজানো গোছানো অঞ্চল (built up areas), ডকইয়ার্ড বা এয়ারক্র্যাফট্ ফ্যাক্টরি নয়।" ব্রিটিশ পরিকল্পনাকারী লর্ড চেরওয়েল বোম মারার পরিকল্পনায় বলেছিলেন, ১৫ মাসের মধ্যে জার্মানির ৫৮ টা শহরের বেশির ভাগ মানুষ "তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে। খতিয়ে দেখা গেছে, কারোর বাড়ি ভেঙে দিলে তা তার মনোবল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করে। তার বন্ধু বা আত্মীয়রা মারা যাওয়ার চেয়েও এটাতে লোকে বেশি ভেঙে পড়ে।..." ১৮ নভেম্বর ১৯৪৩ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৪৪ ব্রিটিশ বোমারু বিমান ১৬ বার বার্লিন শহর আক্রমণ করে। ৯০০০ বোমা ফেলা হয় বার্লিনে। (দি সেকেন্ড ওয়র্ল্ড ওয়র, এ শর্ট হিস্ট্রি, আর. এ. সি. পার্কার, ২০০১, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা যায় দেড় কোটি মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ছ' কোটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামরিক মানুষের চেয়ে অসামরিক মানুষ মারা গিয়েছিল দ্বিগুনেরও বেশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল সমরাঙ্গনে, মূলত সামরিক বাহিনীর মধ্যে। এই যুদ্ধে যতজন মারা গিয়েছিল, তার দুই তৃতীয়াংশ ছিল সামরিক মানুষ, আর এক তৃতীয়াংশ অসামরিক মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল অসামরিক জনপদে।

আরও রূপান্তরিত যুদ্ধ : দেশ-জাতি-রাষ্ট্র ছাপিয়ে

যুগোশ্লাভিয়ার ওপর আক্রমণ করেছিল ন্যাটো বাহিনী গত দশকের শেষ দিকে। মার্কিন এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রই ছিল এই আক্রমণের পাণ্ডা। কেন এই আক্রমণ, এই যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছিলেন (২২ এপ্রিল ১৯৯৯, শিকাগো ইকোনমিক ক্লাবে বক্তৃতা), "এটা একটা ন্যায় যুদ্ধ। এই যুদ্ধ কোনও ভূমিখণ্ড দখলের যুদ্ধ নয়, মূল্যবোধের যুদ্ধ। ... কুড়ি বছর আগে হলে আমরা হয়ত কসভোতে যুদ্ধ করতে যেতাম না। আমরা হয়ত তাকাতামই না ওদিকে। এই পরিবর্তনের কারণ কিন্তু এক বিস্তীর্ন পরিবর্তনের ফল — ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান, প্রযুক্তির পরিবর্তন, গণতন্ত্রের বিস্তার। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো ব্যাপার একটা আছে। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বায়ন আমাদের অর্থনীতি এবং আমাদের কার্যকলাপের রূপান্তর ঘটিয়েছে। আমরা আজ এমন একটা পৃথিবীতে বাস করি, যেখানে আলাদা আলাদা থাকার আর কোনও জায়গা নেই। জাতি নির্বিশেষে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে পরস্পরের সাথে। আমাদের অনেক ঘরোয়া সমস্যার সূচনা হয় পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। এশিয়ার লগ্নির নড়বড়ে অবস্থা চিকাগো বা ডুরহাম কাউন্টির চাকরি ধ্বংস করে। ক্যারিবিয়ানের দারিদ্র্য ওয়াশিংটন এবং লন্ডনের রাস্তাঘাটে ড্রাগের বাড়বাড়ন্ত ঘটায়। বলকানের কোনও দ্বন্দ্বে জার্মানি এবং আমেরিকায় শরণার্থী সমস্যা তৈরি হয়। এইসব সমস্যার কোনও সুরাহা তখনই হবে যখন আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথে হাঁটতে পারব। আমরা এখন সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদী, আমরা চাই বা না চাই। আমরা বিশ্ববাজারে অংশগ্রহণ না করে পারি না, যদি আমরা উন্নতি করতে চাই। আমরা অন্যান্য দেশের নতুন রাজনৈতিক আইডিয়াকে অবহেলা করতে পারি না, যদি আমরা ইনোভেট করতে চাই। আমরা অন্য দেশে দ্বন্দ্ব এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার প্রতি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি না, যদি আমরা নিজেরা নিরাপদে থাকতে চাই।"

২০০২ এর ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল' শীর্ষক একটি বইয়ে এ বিষয়ে মার্কিন মতটি ব্যক্ত করা হয়, "আমেরিকা আজ যে নিরাপত্তার পরিবেশের মুখোমুখি, তা আগেরগুলির চেয়ে মৌলিকভাবে আলাদা। ... সন্ত্রাসবাদীরা গণবিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করছে, এর থেকে বড়ো আশঙ্কা আগে খুব একটা হয়নি। আমাদের শত্রুদের এই ধরনের শত্রুতা আটকানোর জন্য আমেরিকা প্রয়োজনে আত্মরক্ষার অধিকারের জায়গা থেকে আগেই কাজ করতে শুরু করবে। ..."

২০ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ মার্কিন কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন, "যে সব জাতি সন্ত্রাসবাদকে সাহায্য করছে বা জায়গা দিচ্ছে, আমরা তাদের তাড়া করব। প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিটি জাতিকে আজ একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয় তোমরা আমাদের সাথে, অথবা তোমরা সন্ত্রাসবাদীদের সাথে। আজ থেকে, যে কোনও জাতি, যে সন্ত্রাসবাদকে জায়গা দিচ্ছে বা সাহায্য করছে, আমেরিকা তাকে নিজের শত্রু রাজত্ব বলে মনে করবে।"

ব্লেয়ারের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, বিশ্বায়ন এবং বিশ্বজুড়ে আনাচে কানাচে যুদ্ধ পরিস্থিতি একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। বুশ এবং ব্লেয়ার কথিত পরিবর্তিত পরিস্থিতির মানে দাঁড়ায়, পুঁজির বিশ্বায়নের যুগে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির এক অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা। পুঁজির আজকের রূপের কাছে প্রবল পরাক্রমী রাষ্ট্রনায়কও অসহায়, ব্লেয়ারের কথায় এর সুর স্পষ্ট। দেশি পুঁজির বাজার এবং কাঁচামালের স্বার্থে চালিত হয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে যার সূচনা, তারও এক রূপান্তর আমরা দেখি, যখন বিশ্বায়িত কর্পোরেট পুঁজির বাস্তবতা মেনে তাবড় রাষ্ট্র সারা বিশ্বে সশস্ত্র নাক গলানোর বাধ্যবাধকতার কথা স্বীকার করে।

এ যে শুধু বুশ বা ব্লেয়ারের ব্যক্তিগত বা মতাদর্শগত (নিও কনজারভেটিভ) ব্যাপার নয়, তার পরিচয় আমরা পাই যখন দেখি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে পরিবর্তনের কেতন উড়িয়ে ওবামা আসার পরেও একই ব্যাপার চলছে। ওবামা আসার পর বছর ঘুরে গেলেও ইরাক থেকে মার্কিন সেনা এখনও সরেনি। আফগানিস্তানে আরও মার্কিন সেনা পাঠানো হয়েছে, বোমারু বিমান হানা আরও জোরদার করা হয়েছে। পাকিস্তানের পশ্চিম প্রদেশে মার্কিন বিমান হানা ভয়ঙ্করভাবে বাড়ানো হয়েছে। খোদ পাকিস্তান যাতে নিজের দেশবাসীর ওপর এই বিমান হানা সংগঠিত করে তার জন্য মার্কিন চাপ আরও বাড়ানো হয়েছে। ওবামার মত, বুশের আমলে ইরাকের প্রতি নজর দিতে গিয়ে লাদেন, আল-কায়দার ওপর নজর কম হয়ে গেছে। এবার নজর বাড়ানো হচ্ছে। অর্থাৎ সশস্ত্র নাক গলানো এবং দূরে গিয়ে, উড়ে গিয়ে যুদ্ধের বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। সাদ্দাম না লাদেন, সেই নিয়ে ডিবেট।

মতাদর্শ তো কোন ছাড়, এটা কোনও নির্দিষ্ট রাষ্ট্রেরও বিষয় নয়। এর উদাহরন, চীনের প্রত্যক্ষ মদতে এবং অস্ত্র ও অর্থানুকুল্যে যুদ্ধটি সংগঠিত হল শ্রীলঙ্কায় এবং যে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এলটিটিই-কে নিকেশ করা হল লাখ লাখ তামিলকে উচ্ছেদ করে, হত্যা করে। এই চীনের শ্রীলঙ্কা যুদ্ধের সঙ্গে আমেরিকার পাকিস্তান যুদ্ধের পার্থক্য কতটা?

যুদ্ধের রূপান্তর : লাভের হিসেব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেল, বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে সবকটি দেশ সমস্যায় পড়েছে। ফ্রান্স, রাশিয়ায় দেশের ভেতরের অর্থনীতি সংকটে পড়ল। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক তো যুদ্ধে হেরেই গিয়েছিল, তার ওপর নেমে এসেছিল যুদ্ধের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির অনেকটা দায়ভার। ব্রিটেনের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি অতটা মারাত্মক না হলেও, যুদ্ধ চলাকালীন শ্রমিক বিক্ষোভে দেশের ভেতরের অর্থনীতি সঙ্কটে পড়ে।

রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হয় ১৯১৯ সালে। এক বিশাল উপনিবেশের অধিপতি হওয়ার কারণে আর্থিক সংকটের অনেকটা সেইসব উপনিবেশের ওপর ন্যস্ত করেছিল ব্রিটেন। আমেরিকা অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের ফলে খুব একটা সমস্যায় পড়েনি। কিন্তু তাদের যোগদানও ঘটেছিল অনেক পরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা গেল পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। ইউরোপ এবং আমেরিকা যে সঙ্কটে পড়েছিল, অর্থনৈতিক মন্দায় পড়েছিল, সেই মন্দা শেষ হয়ে গেল এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। রুচি ফিরল মার্কিন অর্থনীতিতে। যুদ্ধাস্ত্র এবং স্টিল প্রভৃতির চাহিদা বেড়ে গেল মারাত্মক ভাবে। প্রতিটা দেশেই ধ্বংস সাধনের মধ্যে দিয়ে নয়া পণ্যের জন্য সমাজে জায়গা তৈরি হল। পণ্য বা সম্পদ ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি পণ্যের যে আয়ুষ্কাল তাকে কমিয়ে দিয়ে নয়া পণ্যের জন্য সমাজে জায়গা তৈরি করা যায় — গতি পায় পুঁজি। আর যুদ্ধের চেয়ে ভয়ানক পণ্য ধ্বংস আর কী হতে পারে? ধ্বংসের মধ্যে দিয়েও পুঁজিকে গতিশীল রাখা, পুঁজিবাদকে চালু রাখার এই নয়া কায়দা শিক্ষণীয় হয়ে রইল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দু'দশক বিশ্বপুঁজি ব্যবস্থা আর কোনও সঙ্কটে পড়ে নি।

যদিও যুদ্ধ পুঁজির সচলতাকে বাড়ায়, কিন্তু তা দেশের পণ্য অর্থনীতিকে খানিকটা পঙ্গু করে বইকি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেশের মধ্যে ব্যয় সঙ্কোচনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সরকারের পক্ষ থেকে নোটিশ লটকানো হয়েছিল, আহ্বান জানানো হয়েছিল, বেশি বেশি করে কাজ করার জন্য। আর ব্রিটিশদের তরফে বলা হয়েছিল, নাগরিকদের খরচ কমাতে, সেভিংস বাড়াতে। নিঃসন্দেহে পণ্য-চলাচলের অর্থনীতির বিপরীতধর্মী কথা এটা। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পণ্য অর্থনীতির নবজীবন লাভের কাছে এ আর এমন কি?

কিন্তু বিশ্বায়ন পরবর্তী যুদ্ধ এক কাঠি ওপরে। এখন দেখা যাচ্ছে, দেশ যদি যুদ্ধ চালানোর জন্য একটা কড়া অর্থনীতি সদা সর্বদা বানিয়ে রাখতে পারে, তবে যুদ্ধ জনিত আর্থিক আঘাত আসে না। এত বড়ো বড়ো দুটো যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, আফগানিস্তানে যুদ্ধ করছে আমেরিকা এবং ব্রিটেন। এ দুটি যুদ্ধের ফলে ওই দেশদুটি যে কোনও সঙ্কটে পড়ল তাও নয়। আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরুর পরে এবং ইরাক যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কিন সেনাবাহিনীকে একসাথে ৬০টি যুদ্ধ চালানোর জন্য প্রস্তুত থাকার কথা বলেছিলেন। দুটো দেশে এদেশের সেনাবাহিনী গিয়ে যুদ্ধ করছে। সেই দেশ দুটি এই দেশের সীমানার অনেক দূরে। ওই দূরের দেশদুটি এই দেশের মাটিতে কোনও ক্ষেপণাস্ত্রও মারতে পারবে না। এই যুদ্ধে ওই দুটি দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে। অথচ আগ্রাসনকারী দেশটির মানুষেরা মহা আনন্দে রয়েছে। তাদের আনন্দ ফুর্তি হাসি প্রভৃতির ইতর বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছে না। যুদ্ধের এই রূপ সম্ভবত আগে কখনও দেখা যায়নি। আগ্রাসনকারী ওই দেশদুটির পণ্য অর্থনীতি কোনও সমস্যাতে পড়ল না এই দুটি যুদ্ধের জন্য। হ্যাঁ, কিছু লোক মারা গেল। তার জন্য দেশের মধ্যে কিছু লোক ক্ষুব্ধ হল। কিন্তু আমেরিকায় সরকার বদল হল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কারণটা হল ২০০৮-এর লগ্নি সংকট। তাতে বিপুল পরিমাণ মানুষের বেকার বনে যাওয়া। ঘর-বাড়ি হারানো।

যদিও পুঁজির সামগ্রিক লাভ এই দেশের স্বার্থের চেয়ে এখন বড়ো। আর কর্পোরেট বহুজাতিকরা যেহেতু এখন পুঁজির মূল চালিকা, এই পুঁজির বহুজাতিক সংগঠন পুঁজির সামগ্রিক স্বার্থ দেখতে সক্ষম, দেশ-জাতির সীমানা ছাপিয়ে। তাই সামগ্রিক পুঁজি অর্থনীতিতেও যুদ্ধ লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। তাই মনে হয়, ওপরমহলে প্রায় কোনও বিরোধিতা ছাড়াই এই ইরাক এবং আফগানিস্তান যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের এলাকা সম্প্রসারিত হচ্ছে পাকিস্তানে। আস্তে আস্তে। পেশোয়ার শহর পর্যন্ত চলে এসেছে যুদ্ধ।

এখন যদি ইরাক থেকে বা কয়েক বছর পর যদি আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহৃত হয়ও, তাহলেও কিছু হেরফের হয় না। এই দুটি দেশ এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কর্পোরেটের মৃগয়াভূমিতে পরিণত হল কি না, সেটাই বিবেচ্য। সেখানে মোটামুটি অবাধ লুন্ঠন প্রক্রিয়ার জন্ম হল কিনা সেটাই কিন্তু বিবেচ্য। সেই লুন্ঠনের অবশ্য একটা যুক্তি কাঠামো তৈরি হবে তারপর। তৈরি হবে ন্যায্য লুঠ, অন্যায্য লুঠ — এইসব ভেদাভেদ। আর তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক পরিকাঠামো কাজ করবে। এখন তো আর দেশ দখল দরকার পড়ে না। এ যেন আবার সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকরাজে ফিরে যাওয়ার মতো ব্যাপার।

এখানে একটা বিতর্ক আসতেই পারে। লক্ষ্যটা ঠিক কী? আধুনিক কর্পোরেট দুনিয়ার মৃগয়াভূমি বাড়ানো এবং সেই সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যই যুদ্ধ? নাকি যুদ্ধ নিজেই দরকারি, আজকের সংকটাপন্ন বিশ্ব পুঁজি ব্যবস্থার? প্রথম প্রশ্নটার দিকে আগে তাকানো যাক। একথা মেনে নিতে আজ আর কোনও দ্বিধা নেই যে আজ গোটা বিশ্বজুড়েই পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত। পুঁজিবিশ্বের কাছে এখন আর কোনও 'বাহির' বলে কিছু নেই। অন্তত ভৌগলিক ভাবে। একথা ঠিক যে, গোটা বিশ্বের যে পুঁজি কাঠামো, তা হয়ত এক রকমের নয়। যেমন আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে হরেক রকম পুঁজি আছে, এবং তা মোটেই খুব দুর্বল পুঁজি নয়। যেমন আছে পারিবারিক সম্পত্তি ও পুঁজির হাত ধরে তৈরি হওয়া কর্পোরেট পুঁজি, যার উদাহরন টাটা, বিড়লা, আম্বানি প্রভৃতিরা। তেমনি আছে বড়ো ব্যবসায়ী, বড়ো ওস্তাগার, বড়ো কাঠ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে আমাদের রাইস মিলের মালিক, আলুর হিমঘরের মালিক প্রভৃতিরা। এই দ্বিতীয় ধরনের পুঁজি কিন্তু মোটেই কর্পোরেট পুঁজি নয়। কর্পোরেট পুঁজি স্বাধীন, স্বয়ংক্রিয়। বরং এই পুঁজি ব্যক্তি মালিকের ইচ্ছাধীন অনেকটাই। মালিকের জাতি, জাত, ধর্ম, বাসস্থান, রুচিবোধ, দেশবোধ — এসব অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে এই পুঁজির চলাচলকে। এই পুঁজি কর্পোরেট পুঁজির তুলনায় সামাজিক। এই পুঁজি হয়ত আকারের দিক থেকে কর্পোরেট পুঁজির তুলনায় অনেকটাই ছোটো। হয়ত এই পুঁজি কর্পোরেট পুঁজির তুলনায় অনেক অদক্ষ। তাই এই পুঁজির কর্পোরেট পুঁজির কাছে আত্মসমর্পন বা কর্পোরেট পুঁজির অংশ হয়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই পুঁজির হাতে রয়েছে বাজারের একটা বড়ো অংশ। আরও আছে। এর থেকেও ছোটো ছোটো পুঁজি রয়েছে। রয়েছে এক বিশাল সংখ্যক মালিক চাষি, যারা ব্যবসায়িক চাষের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ যারা কৃষি উৎপাদন করে বাজারে ফসল বেচার জন্য। রয়েছে ছোটো দোকানদাররা। ছোটো বড়ো মিলিয়ে সেটাও কিন্তু পুঁজিই বটে। এবং তার হাতেও রয়েছে এক বড়োসড়ো বাজার। অর্থাৎ কর্পোরেট পুঁজির আওতার বাইরে রয়েছে এক বিস্তীর্ণ এলাকা। এবং এই পুঁজি যে দ্বিতীয় ধরনের পুঁজির মতোই কর্পোরেট পুঁজির পদতলে আত্মসমর্পন করবে, বা তার অঙ্গীভূত হয়ে যাবে, তা নয়। সাম্প্রতিক কালের সংগঠিত রিটেল বিরোধী বিক্ষোভ, দোকানদারদের তরফে, বা কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ প্রতিরোধ — এরই ইঙ্গিত দেয়। এ ছাড়াও আছে রাষ্ট্রীয় পুঁজি। তাই আধুনিক কর্পোরেট দুনিয়ার মৃগয়াভূমি বাড়ানোর জায়গা রয়েছে।

তবে এই মৃগয়াভূমি বাড়ানোর অনেক কায়দাও রয়েছে কর্পোরেটদের কাছে। যেমন আছে জমি অধিগ্রহণের আগ্রাসী কায়দা, যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি নন্দীগ্রামে বা পস্কোয় বা কলিঙ্গনগরে বা রায়গড়ে। এখন প্রত্যক্ষ করছি অন্ডালে। যেমন আছে বিটি তুলো বা বিটি বেগুন চাষের জন্য চাষিদের প্রলুব্ধ করা। বা চুক্তিচাষে চাষিদের প্রলুব্ধ করা। এও আরেক কায়দা। এরকম কায়দার কথাই বলা আছে এবারের বাজেটে — কৃষি সংস্কারের নামে যেখানে কৃষিতে কর্পোরেটদের থাবা জোরদার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনেকেই ইরাক যুদ্ধকে বলে, তেলের জন্য যুদ্ধ। ঠিকই তো! যে তেলক্ষেত্রগুলো ছিল ইরাকের রাষ্ট্রীয় পুঁজির মালিকানাধীন, তা হয়ে গেল কর্পোরেটদের মালিকানাধীন। এটাও তাই এক কায়দা বৈকি। কিন্তু এটাই সব নয়।

এছাড়াও ইরাক যুদ্ধের একটি অন্য তাৎপর্য রয়েছে। এবং শুধু ইরাক যুদ্ধ নয়। এতাবৎ কালের সব যুদ্ধের। যুদ্ধ নিজেই একটা বাজার তৈরি করে। পরিকাঠামোর বাজার। যা ছিল, যা ধ্বংস হল যুদ্ধে, তার পুনর্গঠনের বাজার।

ইরাকের ক্ষেত্রে যার নাম ইরাক রিকনস্ট্রাকশন। এই ধ্বংস এবং পুনর্গঠন আজকের পুঁজি ব্যবস্থার এক অন্যতম চালিকা শক্তি। আর ধ্বংসের সবচেয়ে বড়ো উপায়, যুদ্ধ। তাছাড়া, যুদ্ধের 'ভোগ' অর্থাৎ যুদ্ধাস্ত্রের বাজার তো আছেই।

২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন শুরু হয়। এপ্রিল মাসেই আমেরিকার পৌরহিত্যে শুরু হয় 'ইরাক রিলিফ এন্ড রিকনস্ট্রাকশন ফান্ড' গড়ার কাজ। একা আমেরিকা এটাতে দেয় ১৮.৪ বিলিয়ন ডলার। আইএমএফ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ দেয় আরো কিছু। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে এই ফান্ডের টাকা খরচ হলেও ২০০৯-এর মধ্যে এই রিকনস্ট্রাকশন বাবদ আন্তর্জাতিকভাবে খরচ হয়েছে ৫০ বিলিয়ন ডলার। প্রায় পুরোটাই দিয়েছে আমেরিকা। এই রিকনস্ট্রাকশনের গোটা ব্যাপারটাই দেখভাল করছে আমেরিকার ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে। এই পুনর্গঠনের দেখভালের অফিস 'স্পেশাল ইন্সপেক্টর জেনারেল ফর ইরাক রিকনস্ট্রাকশন' বা SIGIR তিনটি মূল এলাকা চিহ্নিত করেছে উন্নয়নের জন্য : ১) একটা নতুন ইরাকি সেনাবাহিনী গঠন; ২) মুক্ত বাজার অর্থনীতি গঠন; ৩) দেশটিকে একটি ফলপ্রসূ গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়া। এতে ২০০৯ এর জানুয়ারিতে যোগ হয়েছে আরেকটি এলাকা; ৪) ইরাক ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা, যাতে 'ভবিষ্যতের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টাগুলি'তে সুবিধা হয়। ২০০৩-এর অক্টোবরে স্পেনের মাদ্রিদে মার্কিন পৌরহিত্যে এক সম্মেলনে রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ২০০৪-০৭ পর্যায়ের মধ্যে ইরাকের পুনর্গঠনের জন্য কোন খাতে কত ডলার দরকার তার একটা হিসেব দেয়। নিচে তা দেওয়া হল :

বিদ্যুৎ	১২.১২ বিলিয়ন ডলার
জল, নিকাশি, বর্জ্য	৬.৮৪ বিলিয়ন ডলার
শিক্ষা	৪.৮১ বিলিয়ন ডলার
যোগাযোগ ও পরিবহন	৩.৪১ বিলিয়ন ডলার
কৃষি ও জল সম্পদ	৩.০৩ বিলিয়ন ডলার
স্বাস্থ্য	১.৬০ বিলিয়ন ডলার
গৃহ ও জমি	১.৪২ বিলিয়ন ডলার

এছাড়াও আছে কর্মসংস্থান, শহর পরিকল্পনা, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। প্রতিটিতেই ১ বিলিয়ন ডলারের অনেক কম ধরা হয়।

মূল যে ফান্ড, IRRF, যা মূলত মার্কিন প্রদত্ত এবং পরিচালিত, তার থেকে পুনর্গঠনের বরাত পায় মার্কিন কর্পোরেটরা। নিচে তা দেওয়া হল :

বেখটেল	২.৪০ বিলিয়ন ডলার (পরিকাঠামো)
এএমইসি	১ বিলিয়ন ডলার (জল, নিকাশি)
পার্সনস কর্পো.	১.৩ বিলিয়ন ডলার (কনস্ট্রাকশন)
ওয়াশিংটন গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল	০.৫৮ বিলিয়ন ডলার (জল)
হ্যালিবার্টন	০.৫৮ বিলিয়ন ডলার
সিমবিওন পাওয়ার	০.২৫ বিলিয়ন ডলার (বিদ্যুৎ)

উল্লেখ্য, সবচেয়ে বেশি বরাত পাওয়া বেখটেল ২০০৬-এ প্রথম কর্পোরেট হিসেবে ইরাক থেকে পালায়। ইরাক পুনর্গঠনের অনেক প্রকল্পই এখনও অবধি বাস্তবায়িত করা যায়নি। কারণ সশস্ত্র প্রতিরোধ। এই পুনর্গঠনের কাজে নেমে এখনো অবধি কয়েক হাজার মানুষ খুন হয়ে গেছে। বাগদাদকে আরেকটা দুবাই বানানোর ২৫ বছর ব্যাপী এক পরিকল্পনা হয়ে রয়েছে, আটকাচ্ছে ওই নিরাপত্তার জায়গায়। কেউ কেউ বলছেন, এখনও অবধি যে টাকা পুনর্গঠনের জন্য খরচ হয়েছে, তার ২৫ শতাংশ, মানে প্রায় সাড়ে ১২ বিলিন ডলার খরচ হয়েছে পুনর্গঠনের কাজে যারা আছে, তাদের নিরাপত্তা খাতে। আর মার্কিন সুরক্ষা দফতরের নিজেদের সংস্থারই হিসেব, প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার চুরি করে নিয়ে ভেগে গেছে কর্পোরেট ও কন্ট্রাক্টররা।

কিন্তু এই সশস্ত্র, নৃশংস প্রতিরোধ কিন্তু কর্পোরেট পরিকল্পনাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে ঠিকই। একটা তাৎক্ষণিক সফল প্রতিরোধের ছবি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটাই সব নয়। কারণ কর্পোরেট পুঁজি কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে যেহেতু স্বয়ংক্রিয়, মানুষ নিরপেক্ষ, সমস্ত ধরনের সামাজিকতা নিরপেক্ষ, তাই সে নিষ্ঠুরতম। ইরাকে কয়েকটি মার্কিন কর্পোরেট প্রাইভেট আর্মিও সাপ্লাই করছে। যেমন, ব্ল্যাক ওয়াটার। সদ্য কৈশোর পেরোনো ভিডিও গেমস খেলা প্রজন্মকে গাদা গুচ্ছের টাকা 'পারিশ্রমিক' দিয়ে প্রাইভেট আর্মি হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে সেখানে। এই প্রাইভেট সেনা পাহারাদার হিসেবে নিয়োগ করছে কর্পোরেটরা, যারা ইরাকে পুনর্গঠনের কাজে যুক্ত। অর্থাৎ ইরাকে পুনর্গঠনের কাজে যে অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে, তা কাজে লাগছে, হ্যাঁ, যুদ্ধে। পুনর্গঠন এবং যুদ্ধের পার্থক্যরেখা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এরই সাথে আছে কর্পোরেট আগ্রাসনের নয়া কায়দা। ২০০৯ এর নভেম্বরে একটি আইন পরিবর্তন করা হয়েছে ইরাকে। ২০০৬ সালে ইনভেস্টমেন্ট ল'তে ইরাকে বিদেশি কোম্পানিগুলি ১০ বছরের কর ছাড়, যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর কর ছাড় এবং জমি লিজ হিসেবে নিতে পারত। এবার আইন সংশোধন করে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের জন্য ইরাকের জমির মালিকানা অবদি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের পতন, আক্ষরিক অর্থেই। এ বছরের গোড়ায় আমেরিকায় মার্কিন বিদেশ সচিব এবং ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি ইরাক-মার্কিন লগ্নি সম্মেলনে ইরাকি প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে এই আইন সংশোধনের কথা উল্লেখ করেন।

শুধু ইরাক নয়, শ্রীলঙ্কার তামিল অধ্যুষিত জায়গা ত্রিঙ্কোমালি প্রভৃতি জেলায় এলটিটিই ধ্বংসের পরেই গড়ে উঠতে চলেছে স্পেশ্যাল ইকনমিক জোন, যেগুলির অনেকগুলিই নাকি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে চীনা কোম্পানিগুলিকে। চীনা সংবাদমাধ্যমে এসেছে, এই সব জায়গায় ভুখণ্ডের মালিকানা অবধি নাকি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে চীনা কর্পোরেটদের।

আজকের পুঁজি ব্যবস্থার কাছে তাই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

যুদ্ধাস্ত্রের রূপান্তর : ধ্বংসাত্মক

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্র : বেয়নেট, মেশিনগান, গ্রেনেড, পিস্তল, বিষ-বাষ্প, রাইফেল, ট্যাঙ্ক, ট্রেঞ্চ মর্টার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্র : মেশিনগান, রাইফেল, মর্টার, রাইফেল, গ্রেনেড, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ-জাহাজ, সাবমেরিন, বোমারু বিমান, পরমাণু বোম

পরবর্তী যুদ্ধগুলির অস্ত্র : ক্ষেপণাস্ত্র, বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক, রণতরী, কার্পেট বম্বিং, রাসায়নিক অস্ত্র, সুইসাইড বোমা

গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রথম আধুনিক রূপ বোধ করি মেশিনগান। মেশিনগান, অর্থাৎ যে বন্দুকে খুব তাড়াতাড়ি অনেক অনেক গুলির বৃষ্টি করা যায়, তা তৈরি করেছিল চার মার্কিন ব্যক্তিগত উদ্যোগ — গাটলিং, ম্যাক্সিম, ব্রাউনিং, লিউইস। কিন্তু প্রায় কোনও দেশের মিলিটারিই এর কদর করেনি প্রথমে। তারা ভেবেছিল, যুদ্ধ তো ব্যক্তি নায়কের ব্যাপার, পটুত্বের ব্যাপার। শত্রুকে যে স্রেফ মেরে ফেলা যায়, এবং তা যে স্রেফ অস্ত্রের কারসাজিতেই সম্ভব হতে পারে, স্রেফ গুলি বৃষ্টি করে, যুদ্ধ সম্পর্কে এই আদর্শহীনতায় তখনও পৌঁছয়নি সেনাবাহিনী।

মেশিনগানের ব্যবহার দেখা যায় প্রথম উপনিবেশের বিদ্রোহ দমনে। মূলত ব্রিটিশদের হাত দিয়ে। ঔপনিবেশিক শাসক যাদের শাসন করে তাদের তো মানুষ বলে মনে করে না, তাই এইরকম অস্ত্রেই তাদের লাভ বেশি। সুদানের ১৮৯৮ সালের ওমডুরমান যুদ্ধে হাজারে হাজারে মাহদি মারা গেল ব্রিটিশ মেশিনগানের সামনে। ছটা ম্যাক্সিম মেশিনগান মিনিটে ছ'শ করে বুলেট উগরে দিতে থাকল। 'এটা আর যুদ্ধ রইল না, হয়ে দাঁড়াল গণহত্যা। একরের পর একর জুড়ে পড়ে রইল মৃতদেহ। ছেঁড়াখোঁড়া মৃতদেহ।' একইরকম বর্ণনা পাওয়া যায় তানজানিয়ার ১৮৯০ দশকের প্রথমদিকে জার্মান পূর্ব আফ্রিকা কোম্পানি এবং হেহে আদিবাসীদের যুদ্ধের। দুটো জার্মান কোম্পানির লোক

দুটো মেশিনগান নিয়ে নিমেষের মধ্যে হাজার হে হে ট্রাইবকে মেরে ফেলল। (অফ আর্মস এন্ড মেন, এ হিস্ট্রি অফ ওয়ার, উইপনস অ্যান্ড অ্যাগ্রেসন। রবার্ট ওকনেল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। ১৯৮৯)

এরপর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক দেশগুলির এইসব অস্ত্র বানানোয় হিড়িক পড়ে গেল।

আজকের যুদ্ধের অস্ত্র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগেই দেখলাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি যুদ্ধ হয়েছে মূলত সেনাবাহিনীর মধ্যে। যুদ্ধাস্ত্র ছিল মূলত সেনাবাহিনীকে খতম করার জন্যই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকেই সেগুলোর লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ এবং সমাজ। তাই যুদ্ধাস্ত্রেরও পরিবর্তন আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার হতে থাকে এমন সব অস্ত্র যা দিয়ে নিমেষে অনেক লোক মেরে ফেলা যায়। অনেকটা বড়ো করে ধ্বংসের বন্দোবস্ত করা যায়। যুদ্ধরত যে কোনও গোষ্ঠীর বা দেশের লক্ষ্য হয়ে ওঠে আরো ভালো অস্ত্রের ব্যবহার। যার সর্বোচ্চ রূপ পারমানবিক অস্ত্রের জন্য রাষ্ট্রগুলির দৌড়াদৌড়ি এবং আমেরিকার পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার। তারপর থেকে যত দিন গেছে, বিস্ফোরকের ব্যবহার বেড়েছে যুদ্ধে। ক্ষেপনাস্ত্র হোক বা বোমারু বিমান থেকে ফেলা বোমা, মূল লক্ষ্য থেকেছে কত টন ওজনের বিস্ফোরক ফেলা হল, তার দিকে। আমেরিকার উপসাগরীয় যুদ্ধ বা ইরাক যুদ্ধের কথা যখন আমরা পড়েছি সংবাদপত্রে ন'য়ের দশকের গোড়ায়, তখন দেখেছি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের ইরাক এবং আমেরিকার পাল্লা দেওয়ার কথা।

আর যুদ্ধ তো এখন আর রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। রাষ্ট্র তো এখন খুঁজে নিয়েছে নতুন শক্তি। সন্ত্রাসের ওপর যুদ্ধ। রাষ্ট্র যখন ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে, বোমারু বিমান নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে, তখন তার সঙ্গে যে যুদ্ধরত সে কি আর তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতে পারে? তাই অরাষ্ট্রীয় শক্তি যখন এইসব যুদ্ধে সামিল হয়েছে, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমমানের বিস্ফোরক এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিস্ফোরক বাঁধা মানুষ সামিল হয়েছে এতে। ইরাক, আফগানিস্তান এবং অধুনা পাকিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যারা লড়ছে, তাদেরও হাতিয়ার এই সব বিস্ফোরক, যাতে এক লহমায় অনেক লোক মারা যেতে পারে। মেশিনগান, মাইন, বিস্ফোরক, ক্ষেপণাস্ত্র — এসবই হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের হাতিয়ারও। এলটিটিই-র কাছে আমরা বোমারু বিমান, সাবমেরিন এবং যুদ্ধ জাহাজ ব্যবহারও দেখেছি। নেহাত জোগাড়ের সমস্যা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিপুল ধ্বংস এবং বিপুল মানুষের মৃত্যু দিয়ে সূচিত হচ্ছে পালটা আঘাতের মাত্রা। ভিয়েতনাম যুদ্ধে সাধারণ মানুষ সাধারণ অস্ত্র নিয়ে লড়ছে, এ দৃশ্য এই সব যুদ্ধে অমিল। পালটা বড়োসড়ো আঘাতের তাড়না প্রতিরোধকারীকেও জনযুদ্ধ থেকে সরে গিয়ে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহারে সামিল করছে। প্রতিরোধে সামরিক কায়দার প্রাধান্য ধীরে ধীরে প্রতিরোধকেও রূপান্তরিত করছে এক যুদ্ধে। যুক্তি হিসেবে সামনে এসেছে, বিপুল ধ্বংস, বিধ্বংসী হিংসার একচেটিয়া অধিকার কেবল আগ্রাসী, যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের নয়।

ইরাকে মার্কিন বোমা-বন্দুকের আঘাতে বা মার্কিন মিত্র ইরাকি বাহিনীর হাতে যেমন নির্বিচারে মানুষ হতাহত হয়েছে, প্রতিরোধকারীদের আঘাতে মৃত মানুষের সংখ্যাও তুচ্ছ নয়। প্রতি মাসে ৮০০ জন করে পুলিশ বা অসামরিক নাগরিক মারা গেছে ২০০৪-এর আগস্টের থেকে ২০০৫-এর মে মাসের মধ্যে — প্রতিরোধকারীদের সুইসাইড বম্বিং-এ (নিউইয়র্ক টাইমস্)। আবার ২০০৩ এর মার্চ মাস থেকে ২০০৪ এর অক্টোবরের মধ্যে কমপক্ষে ১,০০,০০০ লোক মারা গেছে যুদ্ধের কারণে এবং বেশিরভাগই আগ্রাসনকারীদের বিমান হানার ফলে ('ল্যান্সেট' পত্রিকার সমীক্ষা)। উভয় ক্ষেত্রেই অসামরিক মানুষ মারা যাওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি। এই দুই আক্রমণেই সমাজের উঁচুতলার মানুষ যত না মারা গেছে, তার তুলনায় অনেক বেশি মারা গেছে সমাজের নিচুতলার মানুষ। মার্কিন আগ্রাসনে গরীব মানুষের শিকার হওয়ার মতোই উল্লেখযোগ্য, প্রতিরোধকারীদের আক্রমণে বাগদাদের যে শ'পাঁচেক মিউনিসিপ্যাল কর্মী মারা গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে জমাদার — যারা পাড়ায় পাড়ায় গাড়ি নিয়ে ময়লা আনতে যায়। সমাজের দিক থেকে দেখলে, সমাজকে ধ্বংস করে দেওয়ার খেলায় যেন ব্রতী হয়েছে এই যুদ্ধ। আগ্রাসনকারীর নিষ্ঠুরতা, ধ্বংস প্রবণতা দিয়ে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে প্রতিরোধকারীও। হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রতিরোধ উঠে এসেছে সমাজের মধ্যে থেকে। ইরাকে ২০০৩-এর মে মাস থেকে ২০০৪-এর আগস্ট মাসের মধ্যে ২৪,০০০ ইরাকি প্রতিরোধকারী যোদ্ধাকে হয় ধরা হয়েছে বা মারা হয়েছে (ব্রুকিংস ইন্সটিটিউশন, ওয়াশিংটন)। কিন্তু তাতে প্রতিরোধকারী যোদ্ধার সংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েছে কিছুটা। কিন্তু যুদ্ধে সামিল হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই প্রতিরোধও হয়ে উঠছে ধ্বংসকারী। সংগঠিত হিংসা ধাবিত হয়েছে সমাজের বিরুদ্ধে।

যুদ্ধের ন্যায্যতা

ন্যায় যুদ্ধের ধারণার আদিতে আছে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের কথা, আগ্রাসনকারীর হাত থেকে দেশ বাঁচতে যদি আর কোনও পথ না থাকে যুদ্ধ ছাড়া, তাহলে প্রয়োজন যুদ্ধ। তাও দেখতে হবে, সেই যুদ্ধে যেন জেতার আশা থাকে এবং সেই যুদ্ধ যেন আগ্রাসনকারীর যুদ্ধ যে ক্ষতিসাধন করবে তাকে ছাপিয়ে না যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় লেনিন যে ন্যায় যুদ্ধের কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল শোষিতের শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ন্যায্যতার কথা-ও। কিংবা শেষ বিচারে যে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ সমাজকে মুক্ত হতে সাহায্য করে, যেমন ১৭৮৯ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত ইউরোপ জুড়ে ঘটে চলা বিভিন্ন যুদ্ধ, সেইসব যুদ্ধের ন্যায্যতার কথা। অবশ্য লেনিনের একটা সাবধানতা ছিল, পুঁজিবাদ তার শীর্ষ স্তর সাম্রাজ্যবাদে এসে বেশ হাত পা বাঁধা হয়ে পড়েছে। তার পক্ষে আর সামন্ততান্ত্রিক জোয়াল হঠানোর যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রীয় স্তরের যুদ্ধের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধকে তিনি ন্যায় যুদ্ধ বলেছিলেন। গৃহযুদ্ধের প্রসঙ্গে অবশ্য লেনিন সব ধরনের শোষণ, ভূমিদাসত্ব থেকে মজুরি দাসত্ব, বা শ্রমিকের মালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ন্যায় যুদ্ধের অভিধা দেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশের শোষণকারী শাসক শ্রেণীগুলির পরাজয়ের নিমিত্ত গৃহযুদ্ধের ডাক দেন তিনি।

রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশাত্মবোধ। দেশের হয়ে মৃত্যুবরণ সম্মানের, তৃপ্তির — এই লাতিন পংক্তি প্রবাদের রূপ নেয় আধুনিক ইউরোপে। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, এটি যুদ্ধেরও একটি প্রশংসা এবং যোদ্ধার প্রশংসা। 'বুক চিতিয়ে লড়াই'-এর প্রশংসা অবশ্য যুগে যুগেই হয়েছে। এতে কেউ মৃত্যুবরণ করলে বা হেরে গেলেও ওই সাহসের সাথে যুদ্ধই যুদ্ধের মুখ হয়ে থেকেছে দীর্ঘকাল। যুদ্ধের ইতিহাস মোটামুটি সাহসীর ইতিহাস; বলশালীর ইতিহাস। আদর্শনৈতিক ইতিহাস। রাজা-রাজরার আমল থেকেই যুদ্ধের এই দস্তুর। সেখানে যুদ্ধের কায়দা-কৌশল কখনই এই সাহস, বল এবং আদর্শনৈতিকতাকে ছাপিয়ে যেতে চায়নি। ক্রুসেড হোক বা আমেরিকার গৃহযুদ্ধ — সব জায়গাতেই সেনাপতিদের দেখা মিলত, যারা আদর্শনৈতিক যুদ্ধের পক্ষপাতী। যদিও এই আদর্শনৈতিকতা কখনই যুদ্ধের নিষ্ঠুরতাকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি।

রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের এই আদর্শনৈতিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যুদ্ধ যে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির অধীন একটি বিষয়, সেই দিকটি। ঊনবিংশ শতকের যুদ্ধ বিশারদ এবং জেনারেল কার্ল ভন ক্লসউইৎজ তার জার্মান ভাষায় লেখা 'যুদ্ধ বিষয়ক' বইতে লিখেছিলেন, 'যুদ্ধ কোনও স্বাধীন ব্যাপার নয়'। কিন্তু তা সাধারণ রাষ্ট্রীয় রাজনীতির আর পাঁচটা কাজের মতোও নয়। তাঁর পর্যবেক্ষণে, "যুদ্ধ কেবল একটা রাজনৈতিক কাজ নয়, একটা বাস্তব রাজনৈতিক হাতিয়ার। এটা চলমান রাষ্ট্রীয় লেনদেনের অংশ। উপায়টা ভিন্ন"। রাষ্ট্রীয় রাজনীতির

রাজনৈতিকতার খুব একটা আর জায়গা না থাকলে হয় যুদ্ধ।

এসবই উল্টে পাল্টে দিল গেরিলা যুদ্ধ। এই ধরনের যুদ্ধের ইতিহাস অনেক পুরনো হলেও এর বহুল ব্যবহার কিন্তু অত্যাধুনিক। গেরিলা যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় রাজনীতির অঙ্গস্বরূপ যে যুদ্ধ, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গেরিলা যুদ্ধ হল দুর্বলের যুদ্ধ, গরিবের যুদ্ধ। গেরিলা যুদ্ধ সেনাবাহিনীর যুদ্ধ নয়, সাময়িকভাবে অস্ত্রধারী সাধারণ মানুষের যুদ্ধ। অস্ত্রে এবং সংখ্যায় অনেক শক্তিশালী দমনকারী শত্রুর সঙ্গে জেতার লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ। মোটামুটি যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত যে আদর্শনৈতিকতা, তার থেকে মুক্ত। অনেক বাস্তবমুখী। গেরিলা যুদ্ধ লড়া হয় যে কোনও মূল্যে জেতার জন্য। গেরিলা যোদ্ধা শত্রুকে আক্রমণ করে যখন শত্রু বিশ্রাম নিচ্ছে, তখন। আর শত্রু আক্রমণ করলে পালায়। শত্রুর মুখোমুখি হতে চায় না। শত্রুর সেই জায়গায় আক্রমণ করা হয়, যেখানে মারলে সব থেকে বেশি লাগবে। গেরিলা যুদ্ধ যখন এই অত্যাধুনিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে ফিরে এল, তখন কিন্তু তা ফিরে এল একা নয়, এক সামগ্রিক জনযুদ্ধের পরিকল্পনার অনুষঙ্গ হিসেবে। এই জনযুদ্ধ কিন্তু সত্যি সত্যিই যুদ্ধকে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির একচেটিয়া ব্যাপার স্যাপারের বদলে জনতার ব্যাপারে পরিণত করল। একটি ছোটো গেরিলা যোদ্ধা বাহিনীর সাথে সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে জনপদ, কৃষকরা। গোটা জনপদকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করতে পারার মধ্যেই লুকিয়ে আছে জনযুদ্ধের সাফল্য। আর এই লক্ষ্যে গেরিলা কায়দার বিকল্প নেই। জনযুদ্ধের ধারণার জনক চীনা বিপ্লবের নেতা মাও সে তুং-এর ঘনিষ্ঠ লিন পিয়াও-এর কথায়, "গেরিলা যুদ্ধ প্রক্রিয়াই একমাত্র উপায়, জনতার গোটা শক্তিকে সংগঠিত (mobilize) করে শত্রুর বিরুদ্ধে চালনা (apply) করার। একমাত্র এই উপায়েই আমরা যুদ্ধ চলতে চলতেই আমাদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে পারি...।" এবং জনযুদ্ধ কেবল গেরিলা যুদ্ধের মতো সাময়িক লড়াই করে আবার চাষবাসে মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপার নয়, যুদ্ধ চলতে চলতে এক পুরোদস্তুর সেনাবাহিনী গঠন প্রক্রিয়ারও চালু থাকা। যার মাধ্যমে এক দীর্ঘস্থায়ী, চলমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যাবে। রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের চেনা ধরনের চেয়ে পৃথক হলেও, জনযুদ্ধ ধারণার জায়গা থেকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজচিন্তার বৃহত্তর গন্ডিকে অতিক্রম করতে পেরেছে এমন নয়। জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠবে অন্য ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা, জনতার রাষ্ট্র — এরকমই ছিল চিন্তা। লিন পিয়াও-এর কথায়, '... আমাদের বেস এরিয়াগুলো কার্যত রাষ্ট্রর খুদে রূপ'। চীনে মাও সে তুং-এর মধ্যে দিয়ে এই জনযুদ্ধের প্রথম সফল প্রয়োগ হলেও, এর সবচেয়ে চোখ ধাঁধানো সফল প্রয়োগ হয়েছিল ভিয়েতনামে, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। শোনা যায়, সেখানে গ্রামের মানুষ এমনকি গৃহস্থালীর জিনিসপত্র নিয়ে লড়াই করেছিল হানাদার প্রবল পরাক্রমশালী মার্কিন সেনার বিরুদ্ধে। আবার এও শোনা যায়, জনযুদ্ধ যারা চালিয়েছিল, তারা বাইরে থেকে গিয়ে কিছু ছুটকো-ছাটকা মারপিট করে মার্কিন আগ্রাসনকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল যুদ্ধে অবতীর্ণ নয় এমন গ্রামেও বোমা ফেলতে, যাতে প্রতিক্রিয়ায় সেই গ্রাম মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধে যোগ দেয়। লেনিন কথিত শোষণ-নিপীড়ন-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শোষিত-নির্যাতিত-আক্রান্ত জনতার ন্যায় যুদ্ধে সত্যি সত্যিই জনতাকে সামিল করানোয় জনযুদ্ধ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে। কিন্তু একইসাথে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সমরাঙ্গন থেকে জনপদে চলে আসার যে বিবর্তন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকেই দেখা যাচ্ছিল, অন্যদিক থেকে দেখলে জনযুদ্ধ সেই দিকে পূর্ণতা প্রাপ্তি।

সহায়ক পাঠ :

১) **পিপলস ওয়ার : দি কনডিশন্স অ্যান্ড কনসিকোয়েন্সেস ইন চায়না অ্যান্ড ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া, গারলিং, ১৯৬৯।**

২) **উইকিপিডিয়ার প্রবন্ধ।**

দেশের ভিতর এই 'যুদ্ধ' বন্ধ করো — এখনই!

রাষ্ট্রপতির কাছে একটি আবেদন

দেশের ভিতর একটা 'যুদ্ধ'-এর খবর আমরা সকলেই কমবেশি জানতে পারছি। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত বাহিনী এবং আধুনিক ভয়াবহ যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় সহ দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই হিংস্র মোকাবিলার ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গেও এই 'যুদ্ধ' চলছে লালগড়-জঙ্গলমহল সমেত মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল ও জঙ্গল এলাকায়। এরাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে কোন অন্য যুদ্ধের মতোই এই যুদ্ধে প্রতিদিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। যদিও যুদ্ধের ঘোষিত দুটো পক্ষ রয়েছে, কিন্তু এই দু'পক্ষের বাইরেও হাজার হাজার মানুষ হয়ে পড়ছে গৃহহীন, ইস্কুল-কলেজ-দোকান-বাজার প্রায়শই বন্ধ থাকছে, যুবকেরা হয়রানির ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে, মহিলারা নিগৃহীত হচ্ছে, হতাহত হচ্ছে সাধারণ পরিবারের সদস্যরা, নষ্ট হচ্ছে তাদের খেতের ফসল আর রোজকার জীবিকা। কেউ কেউ বলছে, এটা যুদ্ধের 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' অর্থাৎ পার্শ্ব-ক্ষয়ক্ষতি। কিন্তু আমরা সাধারণ পারিবারিক মানুষ উপলব্ধি করি, সমস্ত যুদ্ধের মতো এটাই বর্তমান যুদ্ধের আসল ক্ষয়ক্ষতি। যুদ্ধে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের প্রত্যেকটি মৃত্যুই সমান দুঃখজনক।

ভারতরাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে আপনি নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার নাগরিকদের কোন অংশের প্রতিই প্রতিহিংসার মনোভাব বাঞ্ছনীয় নয়; যদি নাগরিকদের কোন অংশ বিপথগামীও হয়, রাষ্ট্র কি সেই 'বিপথগামী' নাগরিকদের ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে? আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, রাষ্ট্র এক্ষেত্রে যেন সেই ধরনের মনোভাবই তার পরিকল্পনা ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে চলেছে। আমরা আপনার মারফত রাষ্ট্রের সেই মনোভাব পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাই। একই সঙ্গে আমরা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করতে চাই, 'সামাজিক বিপ্লব' অথবা আত্মরক্ষার যুক্তিতে কোনরকম সংগঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের আমরা পক্ষপাতী নই। কখনই দিনের পর দিন এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি চলতে দেওয়া যায় না। আমরা মনে করি, অবিলম্বে দেশের ভিতর এই যুদ্ধ-পরিস্থিতি বন্ধ হওয়া দরকার। রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রতিরক্ষাবাহিনীর সর্বোচ্চ নির্দেশক হিসেবে আপনার কাছে আমাদের বিনীত আবেদন, এই উদ্দেশ্যে আপনি জরুরি পদক্ষেপ নিন।

ধন্যবাদ সহ

সন্মথ নাথ ঘোষ, বুদ্ধদেব দাস, মানিক লাল বিশ্বাস, জি চক্রবর্তী, স্বপন বসু, সমীর জানা, কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল, সুজয় বসু, সুদীপ মৈত্র, গৌতম কুমার পাল, জয়ন্ত, গৌরী রায় নন্দী, রাত্রি চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল কর্মকার, জয়শ্রী রায়, পার্থসারথী চক্রবর্তী, শান্তনু ভট্টাচার্য, সুধীর কুমার নস্কর, শীতল চন্দ্র রায়, বিশ্বজিত রায়, কৃষ্ণা সেন, কানাই লাল বিশ্বাস, জিতেন নন্দী, দীপেন সেন, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, মিহির চক্রবর্তী, অমিতা নন্দী, সৌরীন ভট্টাচার্য, অমিতাভ সরকার, প্রবাল দাশগুপ্ত, তমাল ভৌমিক, মহব্বত হোসেন, বাপ্পা জামান, আরতী দাস, গৌতম দাস, প্রবীর বল, রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, সৌমিত্র সিনহা, শর্মিষ্ঠা সিনহা,

পার্থ কয়াল, রঘু জানা, কল্যাণ রুদ্র, গৌরী রুদ্র, সুশোভন ধর, মলয় বিশ্বাস, অপূর্ব মুখার্জি, মিহির খাঁ, পর্ণব দাস, শমীত আচার্য, বাবলা বসাক, অদিতি সিংহ, শ্রীমান চক্রবর্তী, পরিমল ঘোষ, নমিতা চৌধুরি, বিশ্বজিত চৌধুরি, মলয় বসু, প্রীতিপদ দাস, প্রিয়াংকা মুখার্জি, সোহিনী মুখার্জি, শান্তনু সিনহা রায় চৌধুরি, খোকন চ্যাটার্জি, গোরা গাঙ্গুলি, বাবলু মুখুটি, সৌমেন চক্রবর্তী, বাপী মণ্ডল, সঞ্জয় ঘোষ, বঙ্কিম চক্রবর্তী, পৃথা ভট্টাচার্য, ভবেন দাস, চূর্ণী ভৌমিক, শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারী চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ মাইতি, কিংশুক চ্যাটার্জি, সুমিত কাঞ্জিলাল, অভিষেক রায়, মন্মথ রায়, অরুন্ধতী দাস, সুপর্ণা দস্তগীর, রেবা ভট্টাচার্য, অভ্র ঘোষ, নৈঋতা ভট্টাচার্য, রতন ভট্টাচার্য, বিদিশা ভট্টাচার্য, মনিদীপা ভৌমিক, অন্বেষা চক্রবর্তী, রঞ্জন রায়, গার্গী রায়, অমর নস্কর, স্বপন সেন, দীপক চক্রবর্তী, কাকলী মজুমদার, গৌরাঙ্গ কর, পাপিয়া কর, বাসনা দে, আলপনা দাস, আমেনা খাতুন, হাসিনা বিবি, রামদাস বৈদ্য, সখী খাতুন, জামশেদ মণ্ডল, মহিদুল মণ্ডল, মুহাম্মদ হেলালউদ্দিন, আবুল হাসান, রবিউল ইসলাম, তাইদুল ইসলাম, তাজাম্মুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম, অর্ণব চৌধুরি, জামিল মামুদ, আশিস হাসান, নুরুল ইসলাম, হারাধন জাল, শমীক সরকার, অলক দত্ত, বরুণ দাস, শুভপ্রতিম রায় চৌধুরি, মিত্রা চ্যাটার্জি, রানা জানা, প্রতীপ নাগ, অনুপম দাস অধিকারী, অভিজিত মিত্র, সুফল মাহাত, মহাদেব টুডু, গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়া মিত্র, ভূমেন্দ্র গুহ, শঙ্খ ঘোষ ... [এঁরা সহ মোট ৫২৭ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র ১ মে ২০১০ রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। পরে যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন সেটিও শীঘ্রই পাঠানো হবে।]

এই আবেদনপত্র প্রসঙ্গে একটি চিঠি

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

সুজনেষু,

দেশের মধ্যে চলা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বহুজন স্বাক্ষরিত আপনাদের প্রচারপত্রটি পড়লাম। সাধু উদ্যোগ। যুদ্ধের ফলে উদ্ভুত সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ জীবনের কথা মাথায় রেখে এই প্রচারাভিযানের যৌক্তিকতা নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য। বর্তমান পত্রলেখকও এই মর্মে আপনাদের সাথে সহমত পোষণ করেন। মানবতার স্বার্থে যে কোন সুস্থবুদ্ধির মানুষই আপনাদের কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে সমর্থন জানাবে — এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের প্রচারপত্রের কয়েক বাক্যের ক্ষেত্রে আপত্তি থেকেই গেছে — এ নিয়েই বর্তমান পত্রের অবতারনা।

প্রথম প্যারার আপাত নিরীহ শেষ বাক্যটির মধ্যে যা লুকিয়ে আছে তা দেখে আতঙ্কিত হতে হয়। বাক্যটি হল, ''যুদ্ধে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের প্রত্যেকটি মৃত্যুই সমান দুঃখজনক।'' দান্তেওয়ারা, লালগড়, দণ্ডকারণ্যের সেইসব মহিলাদের কথা একবার ভাবুন যাঁরা যৌথবাহিনীর দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন, ভাবুন সেই বৃদ্ধের কথা যাঁর ছেলেকে বাড়ি থেকে টেনে বার করে খুন করা হয়েছে, ভাবুন সেই মায়ের কথা যাঁর ছেলেকে খেত থেকে তুলে এনে হত্যা করে, তারপর সেই মৃতদেহের দুই পায়ে দড়ি বেঁধে গাড়ির পিছনে আটকে কয়েক কিলোমিটার হেঁচড়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর মা সেই গাড়ির পিছনে দৌড়াচ্ছেন, চিন্তা করুন সেইসব হাজার হাজার মানুষের কথা যারা জল-জঙ্গল-জমি-খাদানের রক্ষা করার দাবিতে সংগ্রাম করছে আর অত্যাচারিত হচ্ছে, গৃহচ্যুত হচ্ছে আর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রীয় আক্রমণে। এই যুদ্ধে যে মৃত্যু হচ্ছে তা দু'পক্ষের — একদিকে জনগণ ও অপরদিকে আধাসামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং শাসকদল ও পুলিশের গুপ্তচর। এই সংগ্রামে মানুষ কেবল পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে না, তারা প্রতিরোধ করছে। খুনি ও নারীধর্ষক যৌথবাহিনী ও গুন্ডাদের শাস্তি দিচ্ছে। আপনারা কি মনে করেন যে বীর সংগ্রামী জনতার মৃত্যু ও জনতার কাছে শাস্তিপ্রাপ্ত হত্যাকারী-ধর্ষকদের মৃত্যু এক? রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও তার প্রতিরোধ কি সমমূল্যজ্ঞাপক? যারা দেশকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে — সেইসব দেশদ্রোহীর মৃত্যু সমান মাপের? একদিকে চার্লস টেগার্ট আর অন্যদিকে ভগৎ সিং-চন্দ্রশেখর আজাদের দল — আপনি দুটি পক্ষের মধ্যে কি কোন পার্থক্য দেখেন না? না 'সব মরণ নয় সমান'। জনগণের শত্রুদের আর বীর বিপ্লবীদের মৃত্যু সমান হতে পারে না। আপনারা যদি তা গুলিয়ে দিতে চান, তাহলে তার মতো বেদনাদায়ক আর কিছুই হতে পারে না।

গত ৯ মার্চ ২০১০-এ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে হিমাংশু কুমারের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। আপনাদের এই অদ্ভুত গোলানো ধারণার একটা স্পষ্ট উত্তর তাঁর বক্তৃতাতে পেয়ে গেলাম। কারণ এ ভাবনা কেবল আপনাদের নয়, সংবাদমাধ্যমগুলিরও। তারা নানা অজুহাতে সমস্ত ধরনের অত্যাচার ও তার প্রতিরোধকে একমাত্রিক হিসেবে দেখাতে চান। প্রচারপত্রের দ্বিতীয় প্যারায় আপনাদের পরিষ্কার ঘোষণা হল — "সামাজিক বিপ্লব অথবা আত্মরক্ষার যুক্তিতে কোনরকম সংগঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের আমরা তীব্র বিরোধী।'' পূর্বোক্ত বাক্যের মতোই আপনাদের এই ঘোষণাটিরও তীব্র বিরোধিতা না করে থাকতে পারছি না এবং এই প্রসঙ্গে হিমাংশু কুমারকে উদ্ধৃত করতে বাধ্য হচ্ছি। ''আমাকে বলা হয় — এই যে চারিদিকে এত হিংসা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে কিছু বলুন। আমি বলি — হিংসা কী, আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। বস্তারে সাতশ গ্রাম আপনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন। আমি তো এর অনেক আগে থেকেই ওখানে আছি। আগে পুলিশের সঙ্গে ছোটোখাটো ঝুটঝামেলার কথা শুনতাম। আমার নিজের সঙ্গেই কতবার ঝামেলা হয়েছে। এক গাঁয়ে একটি তিন বছরের বাচ্চা জলে ডুবে মারা গেছে। পুলিশ এসেছে। এক জিপ ভর্তি পুলিশ। সবার জন্য মুরগি কাটো, মদ আনো। উঠোনে তিন বছরের আদিবাসী শিশুর লাশ পড়ে আছে, ওদিকে পুলিশের দল উঠোনে বসে মুরগি খাচ্ছে, মদ খাচ্ছে। ... সালওয়া জুডুম শুরু হওয়ার পর, আজ পুলিশেরই রেকর্ড অনুযায়ী নকশালদের সংখ্যা বাইশ গুণ বেড়ে গেছে।'' লালগড়ের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে। লালগড়ে আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে (নভেম্বর ২০০৮) ৬০-৭০টি গ্রাম যুক্ত থাকলেও মার্চ-এপ্রিলে (২০০৯) গ্রামের সংখ্যা তিনশ ছাড়িয়ে যায়। জুনে (২০০৯) দমন-পীড়নের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তত নতুন নতুন গ্রামে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে (এপ্রিল ২০১০) ৮০০-র কাছাকাছি গ্রাম এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

লালগড় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে আজ রাষ্ট্রীয় পীড়ন এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দু-চারটি ঘটনার উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

১. ২০ মার্চ ২০১০ থেকে আজ পর্যন্ত লালগড়, শালবনী ও কোতোয়ালী সংলগ্ন এলাকায় বড়ো আকারে যৌথবাহিনী মোতায়েন করে তল্লাশির নামে সারাদিন মর্টার ফাটাচ্ছে এবং গুলি চালাচ্ছে। এই মুহূর্তে 'কর্ডন অ্যান্ড সার্চ অপারেশন'-এর নামে অভিযান চলছে। এই অভিযানের লক্ষ্য গ্রামগুলিকে ঘেরাবন্দী করে গ্রামবাসীর জঙ্গলে যাওয়া আটকানো, এখন প্রত্যেকদিন যৌথবাহিনীর টহলদারী, তল্লাশি অভিযান, লঙ রেঞ্জ পেট্রোলিং প্রভৃতির নামে যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই ১৫/২০ জন থেকে শুরু করে ১৫০/২০০ জনকে গ্রেপ্তার করছে, মারধোর করছে, মানসিকভাবে অত্যাচার করছে, ধমকাচ্ছে। আর ঘটছে একটার পর একটা নিখোঁজের ঘটনা।

২. গত ফেব্রুয়ারি ২০১০ পর্যন্ত নিখোঁজের সংখ্যা ১৫। সরকার তা স্বীকারও করে নিয়েছে। তারপরেও নিখোঁজের সংখ্যা প্রায় ২০। মার্চের ১৬-২০ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন নিখোঁজদের কোর্টে পেশ করার দাবিতে 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি' (PCPA) দু'দিন অনশন, একদিন অরন্ধন, দু'দিন মিছিল-মিটিং সংগঠিত করল। শত শত গ্রামের হাজার হাজার মানুষ

এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করল। এইসময়ের মধ্যেই নিখোঁজ হলেন আরও দু'জন।

৩. মাননীয় শিক্ষক মঙ্গল মাহাতোকের যৌথবাহিনী এইসময় ধরে নিয়ে চলে গেল। ২৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল মাহাতোর ভাইকে পুলিশ শর্ত দিল, মঙ্গলকে মুক্তি দেওয়া হবে, যদি তিনি মাওবাদী নেতাদের ধরিয়ে দেন। তিনি স্পষ্টভাষায় উত্তর দিলেন — আমি একজন রেলওয়ে কর্মী, কাউকে ধরিয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। মন্মথ মাহাতোর ঘটনাও একইরকম। এইভাবে যৌথবাহিনী অসংখ্য মানুষকে গ্রেপ্তার করছে — কোন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই বেআইনিভাবে। ইচ্ছে মতো তাদের কয়েকজনকে কোর্টে হাজির করছে আর কয়েকজনের ক্ষেত্রে করছে না, হত্যা করে এনকাউন্টারের গল্প ছড়াচ্ছে। এপর্যন্ত শহিদের সংখ্যা প্রায় ৮০ জন।

আবার হিমাংশু কুমারের কথায় আসা যাক — ''এই অবস্থায় আপনারা শান্তি ও অহিংসার আশা করছেন। এখন ওখানে যে আদিবাসীরা আছেন, তাদের কাছে সরকার হল হামলাবাজ, আর নকশালরা হল রক্ষক।'' হিমাংশু কুমার চিদাম্বরমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ''আপনার জমি চাই, আপনি লোকের সঙ্গে বসে কথাটুকু বলবেন না। সোজা পুলিশ পাঠিয়ে দেবেন? আর পুলিশ গিয়ে তাদের মহিলাদের বলাৎকার করবে, তাদের খুন করবে, গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে; এইভাবে তাদের জমি নিয়ে নেবেন? এবং এরপর আপনি আশা করবেন Peace — শান্তি।''

আমার একই প্রশ্ন আপনাদের কাছে। সংগঠিত রাষ্ট্রীয় হিংসার সামনে পড়ে মানুষ অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে — আপনারা কি এটাই বোঝাতে চাইছেন? মানুষের আত্মরক্ষার অধিকারও কি থাকবে না?

আপনারা নাম না করে মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বিপথগামী বলে চিহ্নিত করেছেন। মাওবাদীরা লড়াই করছেন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের মদতপুষ্ট একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাঁরা লড়ছেন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের দাবিতে। তাঁদের সংগ্রাম জল-জঙ্গল-জমি-খাদানের ওপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে। তাঁরা লড়ছেন সাধারণ মানুষের ওপর যুগ যুগ ধরে যে অন্যায়, অবৈধ শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে। তাদের লড়াই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই লড়াইকে কি আপনারা বিপথগামী লড়াই বলতে চাইছেন?

সম্পাদকের জবাব

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক,

আপনার চিঠি 'খবরের কাগজ সংবাদমন্থন'-এর দপ্তরে এসে পৌঁছেছে ২৪ এপ্রিল। ওই পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য সেটি 'মন্থন সাময়িকী'-তে প্রকাশ করা হল। একই সঙ্গে সম্পাদকের পক্ষ থেকে চিঠির একটি জবাবও দেওয়া হচ্ছে।

প্রথমেই নিজের অনুভূতি খোলামেলাভাবে লিখে জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। চিঠি পড়ে জানতে পারলাম, দেশের ভিতর চলা যুদ্ধের বিরুদ্ধে মুখ খোলার প্রয়োজনীয়তা অনেকের মতো আপনিও অনুভব করছেন। দেশের ভিতর দেশেরই মানুষের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ চূড়ান্ত অনৈতিক, একথা আজ রাষ্ট্র এবং তার পরিচালকদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। প্রশ্নটা এই মুহূর্তে কেবল অবস্থান গ্রহণ অথবা সমর্থনের নয়, দরকার প্রত্যেকের একটা সদর্থক ভূমিকা পালনের। পরিস্থিতির ধরনটা মণিপুর অথবা কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনীয়। মণিপুর বা কাশ্মীরে রাষ্ট্রের দমনপীড়ন একজনও মণিপুরি বা কাশ্মীরি সমর্থন করে না। সেখানে বলবৎ 'সেনাবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন' থেকে সকলেই রেহাই চায়। কিন্তু রাষ্ট্রকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে কীভাবে? আজ ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড বা পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে যে যুদ্ধ-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা যে আমরা মোটেই চাইছি না, একথা আমরা কীভাবে জানাব? যে যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, একথা আমাদের জানাতে তো হবেই। এই কর্তব্যের প্রেক্ষিত থেকে আমি আপনার মূল বক্তব্যের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

আমি বুঝতে পারছি, 'যুদ্ধে ... প্রত্যেকটি মৃত্যুই সমান দুঃখজনক' এই মনোভাবে আপনার আপত্তি আছে। প্রথমত বলা দরকার, আপনি এক প্রচারপত্রের আকারে যা পেয়েছেন, সেটি আদতে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো একটি আবেদনের বয়ান। নানান জনের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে বয়ানটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। একেবারে প্রতিটি শব্দের হুবহু দায় আমার পক্ষেও নেওয়া সম্ভব নয়, তবে একটা মোদ্দা সহমত রয়েছে। একথা এজন্য বলছি, আপনার কাছে অর্থটা শেষপর্যন্ত দাঁড়িয়েছে, সব মৃত্যু এক বা সমান মাপের বলা হয়েছে। না, তা মোটেই বলতে চাওয়া হয়নি। আপনি এখানে ভুল বুঝেছেন। সেই কারণে একটা উদ্ধৃতিও দিয়েছেন, 'সব মরণ নয় সমান'। সম্ভবত উদ্ধৃতিটা মাও সেতুঙের রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে, তবে খেয়াল করুন, 'জনগণের সেবা করো' শীর্ষক সেই রচনায় (আদতে এটি মাও সেতুঙের একটি বক্তৃতা) তিনি বলেছিলেন, সমস্ত মানুষেরই মৃত্যু হয়, কিন্তু তার তাৎপর্য আলাদা আলাদা। ... জনগণের জন্য মৃত্যুবরণ থাই পর্বতের চেয়েও ভারি। ... সেই অর্থে সব মরণ সমান নয়। তা তো ঠিকই। কিন্তু কোন মৃত্যুতে দুঃখ পাওয়া আর মৃত্যুর মহত্ত্ব-তুচ্ছতার বিষয়টা কি এক? আসলে আরও একটু বলা দরকার, রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের আবেদন করার বিষয়টি যখন এসেছিল, তারপরেই ৬ এপ্রিল দান্তেওয়ারায় ৭৪ জন সিআরপির হত্যাকাণ্ড হয়। ঘটনাটা আমার কাছে ছিল দুঃখজনক। একই সময়ে দিল্লি থেকে অমিত ভাদুড়ি ও জি এন সাইবাবা একটি যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার আবেদন করেন। তাতে বলা হয়, ''আমরা, নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা ৬ এপ্রিল ২০১০ দান্তেওয়ারায় ৭৬ জন জওয়ানের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করছি। দুঃখজনকভাবে, নিজের দেশের দরিদ্রতম জনসমষ্টির ওপর যুদ্ধ ঘোষণার সরকারের ভ্রান্ত নীতিরই এটা প্রত্যক্ষ ফল। ...'' [বাংলা অনুবাদ আমার।] এই বিবৃতিতে কলকাতা থেকেও মহাশ্বেতা দেবী, প্রবাল দাশগুপ্ত, অমিয় দেব, শঙ্খ ঘোষ, বিজয়া চন্দ ইত্যাদি অনেকেই স্বাক্ষর করেছেন। ওঁদের মতোই আমার এই দুঃখ বা শোকজ্ঞাপনের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই। এর মাধ্যমে চার্লস টেগার্ট এবং ভগৎ সিং-রা এক হয়ে যাবেন কীভাবে? আপনি হয়তো এরপরও 'সমান দুঃখজনক' কথাটার মধ্যে 'সমান' শব্দে আপত্তি করতে পারেন। এটুকু আপাতত ভবিষ্যত সংলাপের জন্য তোলা থাক।

আপনি প্রচারপত্রটি সামান্য ভুলভাবে উদ্ধৃত করেছেন — "সামাজিক বিপ্লব অথবা আত্মরক্ষার যুক্তিতে কোনরকম সংগঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের আমরা তীব্র বিরোধী।'' 'তীব্র বিরোধী'র জায়গায় প্রচারপত্রে ছিল 'পক্ষপাতী নই'। যাই হোক, আমার মনে হয়, সংগঠিত বা পরিকল্পিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের সবচেয়ে আদর্শ আধার হল রাষ্ট্র। প্রত্যেক কাজে তার উপযুক্ত পাত্র বা আধার লাগে। চায়ের পেয়ালায় যেমন ভাত খেয়ে যুৎ হয় না, আবার ভাতের থালায় চা পান করাও মুশকিল। আমাদের দেশে রাষ্ট্রের এই সংগঠিত হিংসা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে গত তিন দশকে। এর আগে রাষ্ট্রের আর একটা ঘোষিত কাজ ছিল, নাগরিকদের কল্যাণ অর্থাৎ চিকিৎসা, শিক্ষা, পানীয় জল, বাসস্থান, রাস্তাঘাট ইত্যাদির সামান্য ব্যবস্থা করা। সেসব শিকেয় তুলে ভারতরাষ্ট্র ক্রমাগত খোলাখুলি কর্পোরেট-কল্যাণের কাজে নেমে গেল। এসময় আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা একটা ব্যাপার আমেরিকার পূর্বতন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের কাছ থেকে রপ্ত করেছে — ওয়ার অন টেরর, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ব্যাপারটা যখন যুদ্ধ, তখন হাতিয়ার তো লাগবেই। সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্র হাতে তুলে নিয়েছে উইপন্‌স অফ মাস ডেস্ট্রাকশন অর্থাৎ গণ বিধ্বংসী অস্ত্র।

রাষ্ট্রের হাতে গণ বিধ্বংসী অস্ত্রের সাম্প্রতিক নমুনাটি দেখা যাক। ৬ এপ্রিল দান্তেওয়ারার ঘটনার পর স্বরাষ্ট্র দপ্তর আমেরিকার হানিওয়েল কোম্পানির কাছ থেকে কয়েকটি চালকবিহীন যুদ্ধবিমান ইউএভি (Unmanned Aerial Vehicle)

কিনেছে। ১৫ এপ্রিল 'দ্য স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকা থেকে জানা যাচ্ছে, ১৪ এপ্রিল বস্তারে এই বিমানের পরীক্ষামূলক অভিযানও হয়ে গেছে। বলা হচ্ছে, আপাতত এগুলি নজরদারী এবং স্থল বাহিনীকে খবরাখবর সরবরাহের কাজ করবে। পাকিস্তানে আমেরিকার ইউএভি অভিযান থেকে আমরা জেনেছি, সেগুলি কী ধরনের মারাত্মক গণ বিধ্বংসী। সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করার জন্য এই বিমান থেকে লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হচ্ছে ওয়াজিরিস্তানের পাহাড়ি অঞ্চলে। কিন্তু এতে মারা যাচ্ছে নিরীহ গ্রামবাসীরা, বিশেষত পরিবারের শিশু, মহিলা এবং বৃদ্ধেরা — যাদের পক্ষে বিমান আসার সংকেত পেলেও দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না।

রাষ্ট্রের যুদ্ধ যেখানে এই মাত্রার এক গণ বিধ্বংসী কার্যকলাপে পরিণত হয়েছে, যেখানে সেনায়-সেনায় যুদ্ধের পুরনো স্ট্র্যাটেজি বদলে বিশাল এলাকা জুড়ে অনেক মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করাই লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, সেখানে তার পাল্টা যুদ্ধ অথবা সংগঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের যুক্তি কি সমর্থনযোগ্য? পাল্টা যুদ্ধকেও তো হয়ে উঠতে হচ্ছে পাল্লা দিয়ে নির্বিচার গণ বিধ্বংসী। এ নিয়ে হালফিল এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছি শ্রীলংকা থেকে। সেদেশেও রাষ্ট্রীয় সংগঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিরোধ করার চেষ্টা হয়েছিল সংগঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের পথে। রাষ্ট্র যখন দেশেরই একাংশ নাগরিক প্রতিরোধকারী তামিল গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য গণ বিধ্বংসী যুদ্ধের পথে গেল, প্রতিরোধকারী এলটিটিই-ও সেই পথেই জবাব দিতে চাইল। ল্যান্ডমাইন, আত্মঘাতী বোমার ব্যবহার তো ছিলই। একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০০৬ সালের ২১ জুলাই এলটিটিই মাভি আরু জলাধারের স্লুইস গেট বন্ধ করে দিয়ে কার্যত পূর্ব-প্রদেশের ১৫০০০ গ্রামের জলের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলত রাষ্ট্রের আরও ব্যাপক গণ বিধ্বংসী কার্যকলাপ চালানোর অজুহাত পুষ্ট হল। অবশেষে প্রায় এক লক্ষ তামিল নাগরিককে হত্যা করা হল; গৃহহীন ও দেশছাড়া হল আরও কয়েক লক্ষ।

আপনি প্রশ্ন তুলেছেন, ''সংগঠিত রাষ্ট্রীয় হিংসার সামনে পড়ে মানুষ অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে — আপনারা কি এটাই বোঝাতে চাইছেন? মানুষের আত্মরক্ষার অধিকারও কি থাকবে না?'' না, মানুষ অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে, এটা কখনই কাম্য নয়। আত্মরক্ষার অধিকার কতটুকু আর আমাদের রয়ে গেছে জানি না, আত্মরক্ষার চেষ্টা ছাড়া কিন্তু আমাদের আর কোন উপায়ই নেই। তার অর্থ পাল্টা সংগঠিত পরিকল্পিত হিংসা নয়। সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে মোটেই পেরে ওঠার মতো কিছু নয়। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে পড়ে মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে হিংস্র হয়ে ওঠে, লাঠি ধরে, আরও অনেক কিছুই করে। সেটা স্থায়ী কিছু নয় এবং রাষ্ট্রের সংগঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তাই আমাদের আবেদনে রয়েছে, 'কোনরকম সংগঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের আমরা পক্ষপাতী নই'।

এ প্রসঙ্গে দণ্ডকারণ্যে সিপিআই (মাওবাদী) নেতৃত্বের সঙ্গে 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত গৌতম নভলখা কিছু কথা বলেছেন। ৮ এপ্রিল ২০১০ 'সংহতি' ইন্টারনেট মঞ্চে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া : ডেজ অ্যান্ড নাইট্‌স ইন হার্টল্যান্ড অফ রেবেলিয়ন' রচনাতে তিনি কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করেছেন। যেমন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০ ১২ জন আদিবাসী হত্যা, ২০ নভেম্বর ২০০৯ টাটা-বিলাসপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আক্রমণ এবং লালগড়ে হত্যার ঘটনা সম্পর্কে তিনি ওই দলের মনোভাব জানতে চান। আলোচনার সময় দণ্ডকারণ্যের কর্মীরা নভলখাকে একটি প্রচারপত্র পড়তে দেন। ১৬ এপ্রিল ২০০৯ একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর পর ২৮ এপ্রিল ২০০৯ 'দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটি পার্টি' প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে ওই প্রচারপত্র বিলি করে। তাতে লেখা ছিল : ''আমরা জানি দুঃখ প্রকাশ করলে আপনাদের প্রিয়জনেরা ফিরে আসবে না, আমরা ক্ষমা চেয়ে আপনাদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু আমরা আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের প্রিয়জনের সঙ্গে আমাদের দলের কোন বিরোধ নেই। এটা একটা দুর্ঘটনা। পুলিশ এবং প্যারামিলিটারি হিসেবে মোতায়েন সাধারণ পুলিশ কর্মী সহ সরকারি কর্মচারীরা আমাদের শত্রু নয়। ... তাহলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, কেন আমরা পুলিশ ও প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করি? কেন আমরা ল্যান্ডমাইন ব্যবহার করি? অথবা কেন আমাদের 'হিংসা' ব্যবহার করতে হয়? বাস্তবে ব্যবস্থা (সিস্টেম) এ জন্য দায়ী ... আপনারা ভালোই জানেন, প্রত্যেকটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে লাঠিচার্জ ও বুলেটের মুখে পড়তে হয়। এই শোষক শ্রেণীর সরকার যেমন প্রচার করে থাকে, আমরা উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী কোনটাই নই। আমরা শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তান ... পশ্চাদপদ আদিবাসী এলাকায় জনগণ যাতে শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে পারে, আমরা তাদের সংগঠিত করছি ...'' [বাংলা অনুবাদ আমার।]

এ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, ব্যবস্থা বা সিস্টেমই এসবের জন্য দায়ী। কিন্তু সিস্টেমকে যারা বিচার করতে চায়, বদলাতে চায়, তারা গণ বিধ্বংসী কার্যকলাপকে কীভাবে দেখবে? ল্যান্ডমাইন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্যেই কি এক ধরনের গণ বিধ্বংসী কার্যকলাপের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মিত (in-built) থাকে না? সিপিআই (মাওবাদী)-র পক্ষ থেকে গত কয়েক বছর যাবৎ পুলিশ ও প্যারামিলিটারি ভ্যান, বাস ইত্যাদির ওপর ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, বিহারে ল্যান্ডমাইন প্রয়োগ করা হয়েছে; ছত্তিশগড়ে অসামরিক পরিবহনের ওপরও ল্যান্ডমাইন ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে, 'অপারেশন গ্রিন হান্ট' এবং 'আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট' প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণা কি নিপীড়িতদের ন্যায্য আন্দোলনকে গণ বিধ্বংসী কার্যকলাপের এক আবর্তের মধ্যে আটকে দেবে না? এটুকু নিজে ভাবতে চাইছি এবং আপনাকেও ভাবতে অনুরোধ করছি।

তাই আমি 'দেশের ভিতর যুদ্ধ বন্ধ করো' এই আবেদনের শরিক হতে চাইছি। ইতিমধ্যে মনমোহন সিং, চিদাম্বরমের আশপাশ থেকেও কিছু অন্য কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি লিখেছেন, মাওবাদীদের আমরা বিপথগামী বলে চিহ্নিত করেছি। মোটেই নয়। 'বিপথগামী' (misguided) শব্দটা এসেছে পার্লামেন্ট এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে একটা তর্ককে কেন্দ্র করে। মনমোহন সিং-চিদাম্বরম যখন 'অপারেশন গ্রিন হান্ট'-এর মাধ্যমে মাওবাদীদের নিশ্চিহ্ন করার (wipe out) পরিকল্পনা করছিলেন, তখন কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, মাওবাদীরা যদি বিপথগামীও হয়, তাহলে কি তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে? আমরা সেই সূত্র ধরেই প্রচারপত্রে লিখেছি, রাষ্ট্রকে তার এই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মনোভাব পুনর্বিবেচনা করতে হবে। একইভাবে অন্যত্র আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান বলেছেন, ''আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সেনা মোতায়েন না করার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, মাওবাদীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়।'' [বাংলা অনুবাদ আমার। সূত্র : চিদাম্বরম মাস্ট কুইট, সাম রাজাপ্পা, দ্য স্টেট্‌সম্যান, ১৮ এপ্রিল ২০১০] আর বড়ো মিডিয়া এবং চিদাম্বরমরা যখন ৬ এপ্রিল দান্তেওয়ারার ঘটনার পর আকাশপথে আক্রমণ করার বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছিলেন, তখন এয়ারফোর্সের প্রধান বলেছিলেন, ''সীমান্ত পেরিয়ে শত্রুদের জন্য আমাদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রশস্ত্র এবং সেটা তাদের মারাত্মকভাবে প্রাণনাশ ঘটায়। আমরা সেটা আমাদের নিজেদের (দেশের) মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে পারি না।'' [বাংলা অনুবাদ আমার। সূত্র : চিদাম্বরম মাস্ট কুইট, সাম রাজাপ্পা, দ্য স্টেট্‌সম্যান, ১৮ এপ্রিল ২০১০]

অতএব নানান পরিসরে নানাভাবে এই কথাটা কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে উঠছে, দেশের ভিতর দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে পারে না। আমরা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-পরিচালকদের প্রতি এই সমালোচনাকেই জোরদার করে তুলতে চাই। এই যুদ্ধ দেশের মানুষের আত্মরক্ষা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সাংবিধানিক অধিকারকে মূল্যহীন করে তুলেছে।